গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ৩ সংখ্যা ১৩ - ১৯ আগস্ট, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে রক্ষার দায়িত্ব জনসাধারণের

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবসে কমরেড প্রভাস ঘোষের আহ্বান

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৫তম স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে ৫ই আগস্ট কলকাতার রানি রাসমণি রোডের সমাবেশে জনতার ঢল নেমেছিল। হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে, মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টি হলেও, শ্রোতাদের শৃঙ্খলায় ভাঙন ধরেনি।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''যে সংগঠনে শৃঙ্খলা নেই, তা যদি ১০ লক্ষ লোকেরও সংগঠন হয়, তা হয় মেছোবাজার, তাতে দেশের কিছু ভাল হয় না। তারা কোনও দিন বিপ্লব করতে পারে না। ... বিপ্লবী দল দশ লক্ষ লোকের কম নিয়ে, এমনকী এক লক্ষ লোক নিয়েও বিপ্লব করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস, যদি সে দল সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল হয়, তার প্রতিটি কর্মী শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়...।'' তাঁর এই শিক্ষারই যেন প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর স্মরণ দিবসের সমাবেশে।

নির্ধারিত সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর প্রধান বক্তা, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিগত ৩৪ বছর ধরে আমরা এদেশের সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, প্রয়াত কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এ রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে স্মরণসভার আয়োজন করি। আমরা স্মরণ করি তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক বিপ্লবী সংগ্রামকে, তাঁর জ্ঞান ও শিক্ষাকে, যাতে আমরা যারা তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, আগামী দিনে আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে পাথেয় সঞ্চয় করতে পারি।

আপনারা জানেন, আমাদের মহান শিক্ষকের বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে। সে যুগের যাঁরা নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ মনীষী, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার যাঁরা সংগ্রামী যোদ্ধা ছিলেন, তাঁদের শিক্ষাকে অবলম্বন করেই প্রথম যুগে তাঁর বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা। সে যুগের সমস্ত বড় মানুষদের স্মৃতি তিনি আজীবন বুকে বহন করেছেন। এমনকী এ কথাও বলেছিলেন, এঁদের স্মরণ না করলে, এঁদের না চিনলে, না বুঝলে তোমরা আমার শিক্ষাকে, আমার সংগ্রামকে বুঝতে পারবে না। তিনি স্বদেশি আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লববাদী ধারায় সংগ্রাম করতে করতেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ মতবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সংস্পর্শে আসেন এবং উপলব্ধি করেন, শোষণ থেকে মানুষের মুক্তি একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই সম্ভব। ফলে তিনি মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের স্তর অতিক্রম করে সর্বহারা

তিনের পাতায় দেখুন

লাদাখে বন্যা

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি

লাদাখের লে পর্বতাঞ্চলে হঠাৎ বন্যা ও মাটির ধস নেমে ৬ আগস্ট যে বিপর্যয় ঘটেছে, সে প্রসঙ্গে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন, 'মেঘ ভাঙা হড়কা বানে লে অঞ্চলে যে ঘোরতর বিপর্যয় ঘটেছে, সরকারি হিসেবে ১৩২ জনেরও বেশি মানুষ নিহত ও হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ ও গৃহহীন হয়েছেন, তাতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

এই হড়কা বানের ফলে জনগণ যে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন, তা অতি দ্রুততায় উদ্ধার ও ত্রাণকার্যের দাবি করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়েই পূর্ণশক্তি নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে ঝাঁপিয়ে না পড়ে গতানুগতিক ভূমিকা নিয়েছে।

আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি করছি, অসহায় মানুষগুলির জীবনরক্ষায় এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

৯ আগস্ট লালগড়ের জনসমাবেশে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

৯ আগস্ট সন্ত্রাস বিরোধী মঞ্চের পতাকাতলে লালগড়ে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা ব্যানার্জী ছাড়াও এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেধা পাটকর, স্বামী অগ্নিবেশ ও অন্যান্যরা। সভা পরিচালনা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে এই সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এবং উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমাদের দল আদিবাসী ও অন্যান্য অংশের গরিব জনগণের আন্দোলনের সাথে প্রথম দিন থেকেই যুক্ত আছে। পিসিপিএ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন আমাদের দলের সংগঠক কমরেড বিবেকানন্দ সাউ। যিনি দশ মাস জেল খেটে সদ্য মুক্তি পেয়েছেন। পিসিপিএ-এর অধীনে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় আমাদের দলের কর্মীরা আঞ্চলিক

দুইয়ের পাতায় দেখুন

বিভিন্ন হাসপাতালে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

এম আর বাঙুর হাসপাতাল

১৫ জুন থেকে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালের গেটে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রচার অভিযান শুরু করেন। হাসপাতালের নির্দিষ্ট কিছু দাবি সহ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের স্বাস্থ্যনীতির প্রতিবাদেই এই আন্দোলন। আউটডোরে ডাক্তারদের সময়মতো আসা, প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়ার কাউন্টার খোলা, দুর্ঘটনাগ্রস্ত রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে এক্স-রে করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, দালালচক্র উচ্ছেদ সহ লক্ষ লক্ষ টাকার আর্থিক দুর্নীতির প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দিতে ৩১ জুলাই বাঙুর হাইস্কুলে স্বাস্থ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজ্জাক আলি পুরকাইতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনভেনশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন রুনা পুরকায়েত। মূল প্রস্তাব পেশ করেন স্বপ্না দাশগুপ্ত। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুদীপ চক্রবর্তী, শিক্ষক অশোক বসু, সমাজকর্মী পুতুল দাস, অজয় কুমার রায়, শেখর দে এবং সভার মূল আলোচক ডাঃ সজল বিশ্বাস।

সুব্রত বোসকে সভাপতি এবং স্বপ্না দাশগুপ্তকে সম্পাদক করে কুড়ি জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ

চক্ষু অপারেশনের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র গ্রিন লেজার লেন্স মেশিনের লেন্স লাগানোর দাবিতে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শাখার পক্ষ থেকে হাসপাতাল সুপারের কাছে ২০ জুলাই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সুপার অবিলম্বে নতুন লেন্স লাগানোর জন্য আই ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বাগনান হাসপাতাল

বাগনান হাসপাতালের উন্নয়নের দাবি নিয়ে গত জুন-জুলাই মাসব্যাপী সপ্তাহে দু'দিন করে রোগীদের সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয় ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলতে থাকে। ৩ আগস্ট হাসপাতাল আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ মাইতি, নিখিল বেরা, অসিত খাঁড়া, পম্পা সরকার, রমেন মাইতি। আধিকারিক অবিলম্বে কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

বিশ্বভারতী ও মেডিকেল কলেজে এ আই ডি এস ও-র দাবি আদায়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি-বৃদ্ধি বিরোধী ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা অর্জন করল তাদের জয়। কর্তৃপক্ষ ফি ১০ থেকে ৩০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে আন্দোলনে ফেটে পড়ে ছাত্ররা। এই ক্ষোভকে পুঁজি করে আসর জমাতে প্রতিবাদে নামে ছাত্র পরিষদ এবং সহযোগী সংগঠনগুলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের স্বরূপ ছাত্রদের সামনে প্রকাশ হয়ে যায়। এই ছাত্রসংগঠনগুলো আন্দোলনে একের পর এক অন্তর্ঘাত চালিয়ে আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চালায়। শেষপর্যন্ত আন্দোলনের ময়দান থেকে তারা পিছু হঠে। এই আন্দোলনকে তীব্রতর করতে গড়ে ওঠে 'ফি-বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি'। কমিটি ফি কমানোর দাবি নিয়ে উপাচার্যের কাছে গেলে তিনি তা মানতে অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের ঘরের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান শুরু করে। গভীর রাতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশবাহিনী অতর্কিতে ছাত্রছাত্রীদের ওপর নির্মম আক্রমণ নামিয়ে আনে। গুরুতর আহত হয় ৮ জন ছাত্র। আহত মোট ৫০ জন। এই আক্রমণ সুধী সমাজের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আন্দোলন আরও তীব্র রূপ নেয়। আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীরা সহ হাজার হাজার সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পরের দিন মোমবাতি নিয়ে দৃপ্ত প্রতিবাদী মৌন মিছিল করে বিশ্বভারতী প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে। ঐতিহাসিক ছাতিমতলায় তারা অবস্থান করতে থাকে। ফি-বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। অবশেষে ছাত্রছাত্রীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে কর্তৃপক্ষ সমস্ত ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ফি কমাতে বাধ্য হয়েছে।

বিশ্বভারতীর ভেতরে এবং বাইরে এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এ আই ডি এস ও।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও এ আই ডি এস ও-র আন্দোলন অব্যাহত। এই কলেজে দীর্ঘদিন এস এফ আই-এর জবরদস্তির রাজনীতির বিরুদ্ধে একমাত্র এ আই ডি এস ও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের দিশা দেখাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। হোস্টেলে এস এফ আইয়ের র‍্যাগিং-এর বিরুদ্ধে এবং মেডিকেল শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংগঠনের নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। আন্দোলন ভাঙতে ক্ষিপ্ত, দিশাহারা এস এফ আইয়ের নির্দেশে কর্তৃপক্ষ এ আই ডি এস ও-র তিন সংগঠককে হোস্টেল ও কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। প্রতিবাদে ছাত্ররা আরও তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। চলতে থাকে লাগাতার অবস্থান। বহিষ্কারের এই অন্যায় নির্দেশ শিক্ষকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশও মেনে নেননি। তাঁরাও ছাত্রদের দাবির সমর্থনে সরব হন। অবশেষে কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলন ভাঙতে কর্তৃপক্ষের একইরকম ভূমিকা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়েও। বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলনে এ আই ডি এস ও-র অগ্রণী ভূমিকায় অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এই সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ফলে ক্ষিপ্ত এস এফ আই বারবার নামিয়ে এনেছে আক্রমণ। গুরুতর আহত এ আই ডি এস ও কর্মীরা এস এফ আই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এর পরের ঘটনা খুবই অদ্ভুত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ আই ডি এস ও-র সংগঠকদের এস এফ আই-এর নেতাদের নামে করা অভিযোগ প্রত্যাহার করতে বলেন। না হলে এ আই ডি এস ও কর্মীদের নামে মিথ্যা কেস দেওয়া হবে বলে শাসানো হয়। এস এফ আই-এর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের এই যোগসাজশ সর্বত্র ধিক্কৃত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির ফর্মের দামবৃদ্ধি, বহিরাগত সেল্ফ-ফিনান্সিং কলেজের ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কলেজের ছাত্রদের একই মেধাতালিকা প্রকাশ করার দ্বারা সাধারণ ছাত্রদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলে ডি এস ও। আলিপুর ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য সহায়তা কেন্দ্র খোলা হলে তার ওপর বারবার আক্রমণ চালায় এস এফ আই। রক্তাক্ত আহত হয় ডি এস ও কর্মীরা।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়া, শিক্ষা বিরোধী নলেজ কমিশন, লিংডো কমিশন প্রভৃতির বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ২৭ আগস্ট পার্লামেন্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে। একই দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় ছাত্র মহামিছিলের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

লালগড়ে কমরেড সৌমেন বসু

একের পাতার পর

কমিটি গড়ে তুলেছে এবং আন্দোলনে নিযুক্ত আছে।

আদিবাসী ও জঙ্গলমহলের গরিব মানুষের উপর ব্রিটিশ শাসন থেকেই অত্যাচার-লুণ্ঠন চলেছে। ব্রিটিশ শাসকরা হত্যা করেছে বিরসা মুণ্ডা, তিলকা মাঝির মতো সংগ্রামী আদিবাসী নেতাদের। আজকের সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত মানুষদের অনেকেরই পূর্বপুরুষরা সেই সময় ব্রিটিশ শাসকদের কর্মচারী ছিলেন। স্বাধীনতার পরেও কংগ্রেস শাসনে একই লুঠ-অত্যাচার চলেছে। সিপিএমের শাসনেও তা চলছে। আদিবাসী জনগণের অভাব-অনটন-চাহিদার প্রতি কী কংগ্রেস কী সিপিএম কেউই কোনও নজর দেয়নি, শুধু লাঞ্ছনাই তাদের জুটেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের যে 'মাইন বিস্ফোরণ'কে অজুহাত করে সিপিএম সরকার জঙ্গলমহলে চরম অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল, তা একটি সাজানো ঘটনা। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধেই জনগণ মাথা তোলে, ঐক্যবদ্ধ হয় এবং গড়ে তোলে 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'।

তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের জনগণ যেভাবে নিজস্ব কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাথা তুলেছে তার থেকে প্রেরণা নিয়েই জঙ্গলমহলের আদিবাসী ও অন্যান্য গরিব মানুষ নিজস্ব কমিটি গড়ে তোলে, পুলিসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তেজের সঙ্গে দাঁড়ায় এবং পুলিশকে ক্ষমা চাইতে হবে, জনগণের বাঁচার দাবি মানতে হবে— এই দাবিতে ৯ মাস জঙ্গলমহল অবরোধ করে রাখে, যেখানে পুলিশও ঢুকতে পারেনি। সে সময় কিন্তু জঙ্গলমহলে ব্যক্তিহত্যা হয়নি, অন্য দলের কর্মীদের গায়ে হাতও পড়েনি। ২০০৯ সালের ১৩ জুন পিসিপিএ-র নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে প্রশাসনের আলোচনার পর বলা হয়েছিল, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং পরবর্তী আলোচনা ১৪ জুলাই হবে। অথচ হঠাৎ ১৮ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় যৌথ বাহিনী নামিয়ে দেওয়া হল এবং শুরু হল রাষ্ট্রীয় অত্যাচার এবং সন্ত্রাস। সেই সময়ই মাওবাদী নামে কিছু লোকের দেখা পাওয়া যায়। এবং আজ অভিযোগ উঠেছে, মুষ্টিমেয় হাতে গোনা কয়েকজন মাওবাদী থাকলেও সিপিএম নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মাওবাদী সেজে আদিবাসী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের এবং সিপিএমের বিক্ষুব্ধ লোকদের খুন করাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে নারী ধর্ষণেরও নায়ক এরাই। আমরা জানি, যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি মাও সে তুঙের চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তারা কখনও মাওবাদ শব্দটা ব্যবহারই করেনি। এখানকার এই তথাকথিত মাওবাদীরাই স্বীকার করেছেন, ইতিপূর্বে কেশপুর ও গড়বেতা 'উদ্ধারের' জন্য সিপিএমের সাথে তাদের টাকার লেনদেন হয়েছিল।

কমরেড সৌমেন বসু বলেন, আমরা চাই জঙ্গলমহলের সমস্ত এলাকা থেকে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে, সিপিএম ক্রিমিনালদের জন্য যে সব ট্রেনিং ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে বন্ধ করে অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে, ছত্রধর মাহাতোকে মুক্তি দিতে হবে এবং ১৩ জুনের ফলপ্রসূ আলোচনার ধারাবাহিকতাতেই ছত্রধর মাহাতোর জনগণের কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই সমস্যার মীমাংসা করে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে হবে।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে এলাকায় এলাকায় কনভেনশন

কলকাতা

গোরাবাজার ঃ কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে এবং বাণিজ্যিকীকরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা করেছে তার বিরুদ্ধে ২৪ জুলাই গোরাবাজার বান্ধবনগর হাইস্কুলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক ধ্যানেশ মিশ্র এবং প্রস্তাবের সমর্থনে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। বক্তব্য রাখেন রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য রাজকুমার বসাক।

কেষ্টপুর ঃ ২৫ জুলাই কেষ্টপুরে প্রফুল্লকানন দেশপ্রিয় বিদ্যামন্দিরে আর একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থানীয় ক্ষুদিরাম ফ্রি কোচিং সেন্টারের ছাত্র-শিক্ষকরা মিছিল করে উপস্থিত হন। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন অর্কপ্রভ ত্রিপাঠী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সজল সরকার এবং রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার অন্যতম পৌর প্রতিনিধি উৎপল চক্রবর্তী। সভায় রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে প্রধান বক্তা আশিস বসু শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার সর্বব্যাপক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনাকে ব্যাখ্যা করে এর বিরুদ্ধে সকলকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অধ্যাপক গৌরীশংকর মুখার্জীকে সভাপতি এবং অসমঞ্জ ত্রিপাঠী ও বিপ্লব বালাকে যুগ্মসম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

রাসবিহারী ঃ ১৮ জুলাই কলকাতার রাসবিহারী এলাকার দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য গোপাল সাহা। প্রধান বক্তা শিক্ষক কানাই লাল দাস বলেন, আজ শিক্ষায় যে সর্বাত্মক আক্রমণ নেমে এসেছে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। সভায় ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সহ নানাস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আশিসকুমার বসুকে সম্পাদক করে ৩৭ জনের রাসবিহারী-আলিপুর আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

শ্যামপুর

হাওড়ার শ্যামপুরের অযোধ্যা বেলপুকুর হাইস্কুলে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ছাত্ররা শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধির জন্য তাদের সমস্যার কথা জানায়। পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মানের যে অবনমন হবে সেটা ছাত্র-শিক্ষকেরা খুব উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করেন।

সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষক সুপ্রভাত উপাধ্যায়। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য দীনেশ মোহন্ত বলেন, শিক্ষাকে আজ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল নলেজ কমিশন ও যশপাল কমিটির সুপারিশ, শিক্ষার অধিকার আইন ইত্যাদির মধ্যে কীভাবে শিক্ষা ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে তা প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতমকুমার মান্নাকে সভাপতি করে ১৫ জনের সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

জিয়াগঞ্জ

১১ জুলাই মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে বীরেন্দ্র সিং সিংঘী উচ্চ বিদ্যালয়ে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের আহ্বায়ক ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, সাদেরুল আমিন, কার্তিক মণ্ডল প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ, সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের নেতা নরেশ রায় সহ আরও অনেকে। এম সিরাজ কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষানীতির বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানান। শিক্ষিকা রেবা সিংহকে সভাপতি এবং ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও নিরঞ্জন মণ্ডলকে যুগ্ম সম্পাদক করে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

মার্কসবাদ ও জনগণের প্রতি গভীর দরদবোধ নিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের যাত্রা শুরু

একের পাতার পর

বিপ্লবের আদর্শকে গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষে কমরেড শিবদাস ঘোষই একমাত্র সার্থক মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, যিনি এদেশের মাটিতে যথার্থভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর আগেও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা নেতা ছিলেন, অথবা এম এন রায় সহ আরও অনেক নেতা, মার্কসবাদকে ভিত্তি করে আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারলেন না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, এঁদের সততা, নিষ্ঠা, ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও, মার্কসবাদ, যেটা একটা বৈজ্ঞানিক দর্শন, এই বৈজ্ঞানিক দর্শনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবে প্রয়োগ করতে হয়, সেখানে ঐ নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন। এটা শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্ব নয় — অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবনের সমস্ত দিক ব্যাপ্ত করে একটা জীবনদর্শন এবং তাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হয়। এটা পাণ্ডিত্য দিয়ে চলবে না, শুধু বই পড়ে চলবে না। এই মহান দর্শনকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হবে। এজন্যই রাশিয়াতে প্লেখানভ পারেননি, মার্তভ পারেননি, আরও অনেকে পারেননি, কিন্তু মহান লেনিন পেরেছিলেন মার্কসবাদকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে। যেমন চীনে, লি লি শান ও আরও অনেকে চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। কিন্তু মহান মাও সে-তুং পেরেছিলেন। তেমন কমরেড শিবদাস ঘোষও, ভারতবর্ষে কেন মার্কসবাদ চাই, কেন গান্ধীবাদে চলবে না, কেন অধ্যাত্মবাদে চলবে না, কেন জাতীয়তাবাদী চিন্তায় চলবে না, কেন এদেশের মুক্তির জন্য মার্কসবাদ চাই, সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি তিনি গঠন করেছিলেন এবং সেটাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি।

নতুন কর্মীরা অনেকেই জানেন না, সাধারণ মানুষ যাঁরা আমাদের দলকে ভালবাসেন, তাঁরাও জানেন না, এই দলটা কীভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথম যখন শিবদাস ঘোষ দল গঠন করেন, তখন তিনি কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছেন মাত্র। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার তিনি একজন ভলান্টিয়ার ছিলেন মাত্র। তাঁর পরিচিতি ছিল না, খ্যাতি ছিল না। মাত্র সাতজন সহযোদ্ধা নিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। কোনও সংবাদপত্রের ব্যাকিং নয়, কোনও আর্থিক সাহায্য নয়, কোনও লোকবল নয়, কোনও কিছু নয়। একমাত্র মার্কসবাদের যথার্থ উপলব্ধি আর শোষিত মানুষের প্রতি গভীর দরদবোধ — একে হাতিয়ার করেই তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজকে সিপিএমের কুৎসিত রূপ দেখে সকলেই ধিক্কার দিচ্ছে। শুধু এ রাজ্যে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও সিপিএম আজ ধিক্কৃত। কিন্তু যখন ১৯৪৮ সালে আমাদের দল প্রতিষ্ঠিত হয়, আপনারা অনেকেই জানেন না, অবিভক্ত সিপিআই তখন কী শক্তিশালী দল, তাদের কী বিরাট প্রভাব! সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে তখন মহান স্ট্যালিন ছিলেন, চীনের বিপ্লব মহান মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে সাফল্যের মুখে, ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রাম চলছে। তখন বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের প্রবল জোয়ার। আর অবিভক্ত সিপিআইয়ের নাম 'কমিউনিস্ট পার্টি'। তাদের সাপোর্ট করছে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। সাপোর্ট করছেন মহান স্ট্যালিন, মহান মাও সে-তুং। ফলে এদেশে তৎকালীন সিপিআইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের, বিশেষত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কী সমর্থন ছিল! আর তখন শিবদাস ঘোষ বলছেন, আমি স্ট্যালিন, মাও সে-তুং-কে মহান শিক্ষক হিসাবে মর্যাদা দিই, তাঁরা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। কিন্তু আমি মনে করি যে, এদেশে সিপিআই যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি নয়, যথার্থ মার্কসবাদী পার্টি নয়। এ কথা বোঝানো সেদিন কত কঠিন ছিল! অনেকে ব্যঙ্গ করেছে— শিবদাস ঘোষ কি লেনিন-স্ট্যালিনের চেয়েও বড়? আমরা যখন স্কুলজীবনে দলের সঙ্গে যুক্ত হই, ঘরে-বাইরে পার্টির কথা বলতে গেলে তাদের বোঝানো কঠিন ছিল। অন্যরা এসব বলত। পথভ্রান্ত হলেও তখন অবিভক্ত সিপিআইয়ের নেতারা কর্মীরা সৎ ছিলেন, সংগ্রামী ছিলেন। ফলে তখন সেই দলকে চেনা অনেক কঠিন ছিল। আর এস পি তখন বিরাট পার্টি। স্বদেশি আন্দোলনে অনুশীলন সমিতি থেকে জন্ম নেয় আর এস পি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক তখন বিরাট পার্টি। এই পরিবেশের মধ্যে ৭ জন লোক নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের যাত্রা শুরু। থাকার জায়গা নেই, অফিস নেই। পার্কে পার্কে কাটিয়েছেন। দিনের পর দিন অনাহারে, অর্ধাহারে কাটিয়েছেন। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষকে না খেয়ে থাকতে দেখেছি। আজ কত সমাদর আমাদের ঘরে ঘরে। এই সব কথা আমাদের মনে পড়ে। কী কঠিন ও কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন! সেদিন অনেকেই বলেছেন, আপনার বক্তব্য ঠিক, যুক্তি ঠিক, কিন্তু আপনি পারবেন না। এতবড় দেশ, এত বড় বড় দল, নামকরা নেতা আছেন, আপনি সেখানে কী করবেন? আপনার জীবনটাই, কেরিয়ারটাই নষ্ট হয়ে যাবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, বিপ্লবের পথে সত্য বলে যা বুঝেছি, সেই সত্য নিয়ে আমি লড়ব। লড়তে লড়তে মরব, মরতে মরতে লড়ব। হয়তো আমার মৃত্যুর খবরও কেউ জানবে না। গাছতলায় পড়ে থাকব। কিন্তু আমার সংগ্রামে সত্য থাকলে, আমার বক্তব্যে সত্য থাকলে একদিন মানুষ তার মূল্য দেবে। মানুষ যে মূল্য দেয়, মানুষ যে মূল্য দিয়েছে, তার প্রমাণ, আজ তাঁর হাতে গড়া এই দল একটা বিরাট শক্তিশালী দলে পরিণত হয়েছে। এদেশে ও বিদেশে ক'টা দল এভাবে গড়ে উঠেছে?

আপনারা এসেছেন এখানে এই বর্ষা মাথায় নিয়ে। গ্রামের চাষিরা এসেছেন চাষের কাজ ফেলে রেখে। কলের শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, মহিলারা এসেছেন। তাঁরা এসেছেন কীসের টানে? কী প্রয়োজনে? তার কারণ, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমাদের সকলের বুকে গাঁথা হয়ে আছে। এটাই আমাদের চালিকাশক্তি। এটাই আমাদের প্রেরণাশক্তি। এম এল এ-এম পি-র জোরে নয়, মন্ত্রীত্বের জোরে নয়, সংবাদপত্রের ব্যাকিংয়ে নয়, এই দল এগিয়ে চলেছে সঠিক বিপ্লবী আদর্শের শক্তিতে, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের প্রদর্শিত পথে। আগামীকালও দেখবেন, সংবাদপত্রে খবর নেই। কোথাও থাকলেও হয়ত দু-চার লাইন থাকবে। সত্যিকারের বিপ্লবী দলকে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম কখনই প্রচার দিতে চায় না। কারণ, তারা জানে, বিনা প্রচারেই যার শক্তিবৃদ্ধি হয়, প্রচার পেলে তার শক্তি আরও বাড়বে। কিন্তু তারা কি আটকাতে পারল? আটকানো কি সম্ভব? আজ ভারতবর্ষের ১৯টি রাজ্যে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের দলের শক্তি-প্রভাব বাড়ছে। যারা বিপ্লব চায়, যারা সংগ্রাম চায়, যারা রাজনীতিতে সততা চায়, নিষ্ঠা চায়, শালীনতা চায়, সেই মানুষ আমাদের দিকে ঝুঁকছে। কারওর আটকাবার ক্ষমতা নেই। এই মঞ্চের সামনেই একটা স্থায়ী শহিদবেদি আছে। '৯০ সালের শহিদ কমরেড মাধাই হালদার, আমাদের দলের কিশোর কর্মী। মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছিল সিপিএম সরকারের পুলিশের গুলিতে। পশ্চিমবাংলায় এই সিপিএম সরকারের রাজত্বে আমাদের ১৫২ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। আমাদের ৪৯ জন নেতা-কর্মী মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আছেন। আর কোনও দলকে এই মূল্য দিতে হয়নি। আমাদের আটকাতে পারল সিপিএম? পূর্বে কংগ্রেসও পারেনি, আজ সিপিএমও পারেনি। কেউ পারবে না। অন্যান্য রাজ্যেও আমাদের অগ্রগতি ঘটছে। বিপ্লবী আদর্শের শক্তি, সত্যের শক্তি অমোঘ। তাকে লাঠি দিয়ে, কামান-বন্দুক দিয়ে, গুলি দিয়ে, কোনও কিছু দিয়ে আটকানো যায় না। আটকানো গেলে সভ্যতার অগ্রগতি, ইতিহাসের গতি থেমে যেত। সাময়িক কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারে, ক্ষতি করতে পারে এই পর্যন্ত।

শুধু কি ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষের বাইরেও, দেশে দেশে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ, মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুংয়ের সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে যাঁর অভ্যুত্থান, তাঁর প্লৈবিক শিক্ষার চর্চা চলছে। মানুষ তাঁর শিক্ষা জানতে চাইছে। অথচ তিনি শুরু করেছিলেন সাতজন নিয়ে। সেদিন তাঁকে কে চিনত! এ কথাটা আমি এই জন্য বললাম যে, এখন বহু কর্মী, যুবক কর্মী দলে যুক্ত হচ্ছেন। এখন দলের শক্তি বাড়ছে, আজ তুলনামূলকভাবে সহজে সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এর ফলে তাঁদের মধ্যে যেন আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব না আসে। তাঁরা যেন কখনও ভুলে না যান, এ দলটা কীভাবে গড়ে উঠেছিল, কী সংগ্রামের বিনিময়ে! মাত্র ৫৩ বছর বয়সে কমরেড শিবদাস ঘোষ মারা গেলেন দিবারাত্র ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালিয়ে। বিশাল জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন অমূল্য সম্পদ হিসাবে, যাকে হাতিয়ার করে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সহযোদ্ধা ও অনুগামী কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে আমরা ৩৪ বছর ধরে লড়েছি। গত বছরও তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। এ বছর আমরা যখন ৫ই আগস্ট উদ্‌যাপন করছি, তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের বলেছেন, শুধু বেঁচে থেকে লাভ কী? শুধু খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়ি-বাড়ি — এই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহলে একজন মানুষ আর জন্তুর জীবনে পার্থক্য কোথায়? জন্তুর বুদ্ধি নেই, কিন্তু জন্তুও প্রকৃতির সাথে লড়ে, খাদ্য সংগ্রহ করে। সেও আশ্রয় খোঁজে। সেও বংশবৃদ্ধি করে প্রাকৃতিক নিয়মে। পার্থক্য হচ্ছে মানুষ বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা, মননশীলতার অধিকারী। যেখান থেকে এসেছে মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব, ন্যায়-নীতিবোধ। শুধু নিজেরটা নিয়ে ভাবব এবং বিবেককে তিল তিল করে হত্যা করব, প্রবৃত্তির দাসত্ববৃত্তি করব, তাহলে নিজেকে অসম্মানিত করা হয়। তাই তিনি বলেছিলেন, যদি মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাও, যখন মরবে মাথা উঁচু করে মরতে চাও, তবে তার একমাত্র পথ হিসাবে সমাজমুক্তি আন্দোলনের, বিপ্লবী আন্দোলনের ঝাণ্ডা বহন কর। বলেছেন, এই পথে অনাহারে-অর্ধাহারে মৃত্যু আছে। নির্যাতন আছে, লাঠি খেয়ে, গুলি খেয়ে মৃত্যু আছে। কিন্তু এই পথ গৌরবের, মর্যাদার। বাকি সব পথই অসম্মানের, অমর্যাদার। এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এসেছি। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। শোষিত মানুষের ব্যথা-বেদনা, তাদের চোখের জল বুকে বহন করে সমস্ত যুগে সমস্ত বড় মানুষরাই লড়েছিলেন। হৃদয়বৃত্তিই হচ্ছে তাঁদের সংগ্রামের উৎস, তার আধার। বলেছিলেন, হৃদয়বৃত্তিহীন বুদ্ধির মধ্যে থাকে সততার ছলনা, শয়তানি এবং সেটা লোক-ঠকানো। আমাদের দলে আজও হৃদয়বৃত্তির জীবন্ত চর্চা আছে। বলেছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতির প্রাণ উন্নত চরিত্রের মান। যে রাজনীতির মধ্যে বড় বড় কথা আছে, বড় বড় স্লোগান আছে, কিন্তু রুচি-সংস্কৃতি নেই, মনুষ্যত্ব নেই, তা প্রাণহীন শবদেহের মতো, যাকে ফেলে রাখলে পরিবেশকে দূষিত করবে। সে যত বড় দলই হোক, যত ভিড়ই হোক, তার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই, রুচি-সংস্কৃতি নেই; দল বাড়ছে, লোকজন বাড়ছে, সমর্থন বাড়ছে, কিন্তু দেশে সে দলের প্রভাবে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বাড়ছে না, উন্নত সংস্কৃতি বাড়ছে না। তার অর্থ, দলের মধ্যে উন্নত আদর্শ নেই, উন্নত চরিত্র নেই। সে দল সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই কথা তিনি বারবার বলেছিলেন। আমাদের দলের কর্মীদের দেখে মানুষ আকৃষ্ট হয়। আজকের দিনে আমাদের দলের কর্মীদের দেখে অনেক প্রবীণ মানুষ, স্বদেশী আন্দোলনের যাঁরা শেষ প্রতিনিধি, তাঁরা অনেক সময় বলেন, তোমাদের দেখলে আমাদের সেই ১৯৩০ সাল '৪০ সালের কথা মনে পড়ে যায়। আজ তোমাদের মধ্যেই সেইসব গুণ পাওয়া যায়। এর উৎস কোথায়? আমরা সব নেতা-কর্মী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে উঠতে পেরেছি, তা নয়। আমরা চেষ্টা করছি, লড়ছি — এই পর্যন্ত বলতে পারি। স্তরে স্তরে আমাদের মধ্যে মানের পার্থক্য আছে। কিন্তু যতটুকু আমরা তাঁর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারছি, মানুষের মধ্যে তা অন্ধকারে এতটুকু হলেও আলোর প্রত্যাশা জাগায়। তাই এই ভালবাসা, তাই এই সহানুভূতি, সমর্থন।

কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, একদিন এদেশের রাজনীতির এবং সংস্কৃতির যে উচ্চ মান ছিল, আমরা সেটাকে রক্ষা করতে পারিনি। আমরা ছিন্নমূল হয়ে গেছি। আমরা বড় বড় কথা বলি, বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না। আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে ব্রিটিশ শাসন একটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ছিল। তা সত্ত্বেও এদেশে শত শত ছেলেমেয়ে কেরিয়ার ছেড়ে, চাকরি ছেড়ে, পারিবারিক প্রয়োজন ছেড়ে, কোনও কিছু না চেয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দলে দলে জেলে গেছে, মার খেয়েছে, ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে। কীসের জন্য? সেদিন সামনে ছিল উচ্চ আদর্শ। পথপ্রদর্শক হিসাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন, দেশবন্ধু ছিলেন, সুভাষ বোস ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ছিলেন। ওদিকে লালা লাজপৎ রায় ছিলেন, প্রেমচন্দ ছিলেন, তিলক ছিলেন, ভগৎ সিং ছিলেন, সূর্য সেনরা ছিলেন, গোটা দেশে ছিল তার বিরাট প্রভাব। আমাদের ছোটবেলাতেও দেখেছি, 'স্বদেশি' কথাটা শুনলে আমাদের নিরক্ষর মায়েদের মধ্যেও একটা গভীর আবেগ সৃষ্টি হত। স্বদেশি মানে দেশের জন্য যে সর্বস্ব দিয়েছে। দেশপ্রেমের সেই উচ্চ মান আজ কোথায়? এখন যারা কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছে, রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে, ঝাণ্ডার রঙ তাদের যাই হোক, নাম তাদের যাই হোক, ওদের দেখে কারোর কি মনে হবে, দেশ নিয়ে তারা এতটুকু ভাবে? জনগণ নিয়ে তারা ভাবে? তাদের রাজনীতির মধ্যে কোনও নীতি-আদর্শ আছে? জনগণের প্রতি কোনও দরদবোধ আছে? আছে চূড়ান্ত ভণ্ডামি, প্রতারণা, মিথ্যাচার। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ভোট আর গদি। আজ আমি অপোজিশনে আছি, কাল যাতে মন্ত্রীত্বের গদি দখল করতে পারি, সেজন্য মানুষের বিক্ষোভকে কাজে লাগাও। কেন্দ্রে এখন কংগ্রেস, অপোজিশনে বিজেপি। বিজেপি যতদিন ক্ষমতায় ছিল, অপোজিশনে ছিল কংগ্রেস। তখন কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণের দুঃখ নিয়ে চোখের জল ফেলত। এখন বিজেপি নেতারা চোখের জল ফেলছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এক সময় ক্ষমতায় ছিল, সিপিএম নেতারা চোখের জল ফেলতেন। আবার সিপিএম নেতারা ক্ষমতায় বসে কী করছেন, আপনারা দেখছেন। এই যে একটার পর একটা সরকার আসছে আর যাচ্ছে, তাতে দেশের কী উপকার হচ্ছে?

গতকাল অর্থমন্ত্রী লোকসভায় দাঁড়িয়ে বললেন, মূল্যবৃদ্ধি হবেই। গোটা দেশ মূল্যবৃদ্ধির সংকটে জর্জরিত। আগে ছিল— গত বছরের তুলনায় এ বছর কী দাম বাড়ল, গত ছ'মাস কী দাম

চারের পাতায় দেখুন

দেশের একদল বুদ্ধিজীবী সাম্রাজ্যবাদীদের শয়তানি দেখতে পান না

তিনের পাতার পর

ছিল, এখন কত বাড়ল, গত মাসে কী ছিল, এ মাসে কী বাড়ল। এখন সকালবেলার দাম আর দুপুরবেলার দামে পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে তো বাড়ছেই। আর অর্থমন্ত্রী বলছেন, মূল্যবৃদ্ধি হবেই, কারণ দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন হচ্ছে, উন্নয়ন হলে মুদ্রাস্ফীতি হবে। লোকের হাতে নাকি এখন অনেক টাকা, কিন্তু জিনিসপত্র কম, তাই দাম বাড়ছে। কী রকম হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুর হলে এ রকম বলতে পারে! সব সরকারি দলের নেতাদেরই এ রকম চেহারা! নিজেদের কুকর্মের সাফাই দিতে যখন যা খুশি বলে, মনে করে দেশের লোক বোকা, কিছুই বোঝে না। যদি উন্নয়ন হয়, উৎপাদন বৃদ্ধি হয়, তবে জিনিসপত্রের পরিমাণ তো বাড়ারই কথা। উৎপাদন বাড়ছে মানে জিনিসপত্র বাড়ছে। তা হলে জিনিসপত্র কম কেন? এর উত্তর কে দেবে? আর, কার হাতে টাকা? কোথায় সেই টাকা? কাগজে দেখলাম, দিল্লিতে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজন চলছে। দিল্লির সরকার ভাবছে— বিদেশ থেকে অতিথিরা আসবে, দিল্লির রাস্তায় এক লক্ষের উপর ভিখারি আছে, এদের দেখলে বিদেশিরা কী ভাববে? তাই এখন দিল্লি থেকে এক লক্ষ ভিখারি বিদায় করতে হবে। খোদ দিল্লিতে যদি এক লক্ষ ভিখারি হয়, গোটা দেশের কথা ভাবুন। কয়েক কোটি ভিখারি এবং এই সংখ্যা বাড়ছেই। এই হচ্ছে দেশের উন্নয়নের লক্ষণ! দেশ জুড়ে কোটি কোটি বেকার, অর্ধবেকার। এই মন্দার ধাক্কায় কয়েক কোটি ছাঁটাই হয়ে গেল। হাজারে হাজারে লাখে লাখে গ্রামের মানুষ শহরে ভেঙে পড়ছে। মাইগ্র্যান্ট লেবার বলে একটা শব্দ চালু হয়েছে। এই তো দেশের চেহারা! আর অর্থমন্ত্রী বলছেন, দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, লোকের হাতে অনেক টাকা জমছে, ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে এবং আমাদের তা মানতে হবে। কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়াল। প্রশ্ন উঠল, ভারতবর্ষে পেট্রোল-ডিজেলের এত বেশি দাম সরকারি ট্যাক্সের জন্য। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জবাব দিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে ট্যাক্স বাবদ আদায় করে ১ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা, রাজ্যগুলো করে ৭২ হাজার কোটি টাকা। সোনিয়া গান্ধিও একই যুক্তি করছেন। ফলে রাজ্য প্রশ্ন তুলতে পারে না। মানে, তুমিও ডাকাতি করছ, আমিও ডাকাতি করছি, ফলে তোমার বলার অধিকার নেই। এই হচ্ছে জাস্টিফিকেশন। এই হচ্ছে আজ দেশের রাজনীতির হাল!

যে বাড়তি টাকার কথা অর্থমন্ত্রী বলেছেন, তা জনগণের পকেটে নেই। আছে একচেটিয়া পুঁজিপতি, ব্যবসাদার-চোরাকারবারি-মজুতদার-কালোবাজারিদের কাছে, স্বনামে-বেনামে। মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ, দেশে বিরাট অঙ্কের কালো টাকার খেলা চলছে, এই কালো টাকা ব্রহ্মার শক্তির অধিকারী, তাকে ধরা যায় না, চেনা যায় না অথচ ক্রিয়াশীল। সরকারের ব্যাপক ডেফিসিট ফিনান্সিং চলছে, বিপুল পরিমাণ ভুয়া নোট বাজারে চলছে। মানুষ নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে মারা যাচ্ছে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ লোক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করছে। লক্ষ লক্ষ মা-বোন জীবন নির্বাহের জন্য দেহবিক্রির বাজারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এমনকী ছোট ছোট মেয়েরা, যাদের কোলে তুলে আদর করার কথা, ভারতে প্রস্টিটিউটদের তারাই একটা বিরাট অংশ। আর ওরা বলছে, দেশ এগিয়ে চলেছে। কোথায়? অধঃপতনের দিকে, রসাতলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরাই হচ্ছে দেশের নেতা। সংবাদমাধ্যমে এদেরই ছবি, এদেরই ভাষণ। দেশের জন্য চিন্তায় তাদের ঘুম হচ্ছে না। আগামী দিনে যিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, ইন্দিরা গান্ধী পরিবারের রাজপুত্র, তিনি কোথায় কোন গরিব পাড়ায় গিয়ে রুটি খাচ্ছেন, তারই সচিত্র কাহিনী আপনারা কাগজে কাগজে টিভি চ্যানেলে পান। অথচ দেশের কোটি কোটি গরিব মানুষের চোখের জলের হিসাব কে রাখে? এই তো চেহারা আমাদের দেশের!

শুধু কি আমাদের দেশেরই এই দুরবস্থা? গোটা বিশ্বে আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম সংকট চলছে। এক সময় পুঁজিবাদ এসেছিল সামন্ততন্ত্রের শেষ অধ্যায়ে শিল্পবিপ্লবের ঝাণ্ডা নিয়ে। সেদিন পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল। তার কৈশোর, যৌবন ছিল। কুটির শিল্প ভেঙে বৃহৎ শিল্প গড়ার, আঞ্চলিক অর্থনীতি ভেঙে জাতীয় অর্থনীতি ও জাতীয় শিল্প গড়ার, উপজাতীয় মানসিকতা ভেঙে জাতীয় মানসিকতা গড়ার স্লোগান নিয়ে এসেছিল। ধর্মভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগান নিয়ে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্লোগান নিয়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ এসেছিল, পশ্চিমী দুনিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশকে আলোকিত করেছিল। সে যুগে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল। সে যুগে বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'-র স্লোগান তুলেছিল। আবার এই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরেই মহান মার্কস ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের দ্বারা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, এই পুঁজিবাদই আবার তার নিজস্ব চলার নিয়মেই শিল্পবিপ্লবকে আটকাবে, শিল্পকে ধ্বংস করবে, চূড়ান্ত সংকট সৃষ্টি করবে। আজ সেটা নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছে। মহান লেনিন দেখিয়েছিলেন, মার্কস পুঁজিবাদী সংকটের যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুগে উপনীত হয়ে সেই সংকট তার অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে, পুঁজিবাদের বিকাশ আজ অন্তিম স্তরে পৌঁছেছে। আজ বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে মন্দার মূল কারণ কী? বহুদিন আগেই মার্কস দেখিয়ে গেছেন, এই পুঁজিবাদ হচ্ছে বাজার অর্থনীতি, অর্থাৎ বাজারের জন্য উৎপাদন, বাজারে বিক্রি করেই মুনাফা অর্জন করা। বাজার মানে জনগণ, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা। মার্কস দেখালেন, পুঁজিপতিরা লাভ করে শ্রমিকদের শোষণ করে। শ্রমিক শোষণ ছাড়া পুঁজিপতিদের লাভ নেই, আর শ্রমিক জনগণই বাজারের ক্রেতা, শোষণের ফলে যাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়, ফলে বাজারসঙ্কট আসে। স্ট্যালিন দেখালেন, আজকের পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন, আর সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য চাই সর্বোচ্চ শোষণ। তার ফলে তার বাজার আরও সংকুচিত, ফলে বাজার অর্থনীতির বাজার নেই। ক্রমাগত বাজার সংকোচনের ফলে বিশ্বব্যাপী মন্দা, কলকারখানা বন্ধ, ছাঁটাই, বেকারত্ব। আগে মন্দা আসতো, আবার কিছুটা তেজিভাব আসতো। এখন মন্দা স্থায়ী হতে চলেছে, বড়জোর ডিগ্রি ওঠানামা করছে, কিন্তু মন্দা কাটছে না। হরেক ওষুধপত্র দিয়ে, ভেন্টিলেশনে রেখে, রাষ্ট্রগুলি পাবলিক মানি থেকে অঢেল টাকা দিয়ে, এমনকী বিপুল পরিমাণ ধার করে দিয়েও মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে পারছে না। যারা দাবি করছে, রিকভারি হচ্ছে, তারাই আবার বলছে, এটা ফ্রেজাইল রিকভারি, ফলে ভরসা করার নেই। আজ আর 'ডিমান্ড ড্রাইভেন ইকনমি'র যুগ নেই, এখন চলছে 'ক্রেডিট ড্রাইভেন ইকনমি'। এভাবে ক'দিন চলবে? তাই চলছেও না। অন্যদিকে পাবলিকের টাকা অর্থাৎ সরকারি ফান্ড এবং আরও ঋণ করে রাষ্ট্রগুলি পুঁজিপতিদের অক্সিজেন জোগাচ্ছে। এর সব চাপটাই পড়ছে পাবলিকের উপর। দেশে দেশে আজ এই সংকট। আমাদের দেশেও সেই সংকট।

কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে এসে বলেছিলেন, আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে আর একটা ভয়ঙ্কর শোষণ-শাসনকে আনছি, যেটা পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ। কেন এটা ঘটতে পারল? বলেছিলেন, ভারতে প্রয়োজন ছিল স্বদেশি আন্দোলনের যুগেই মার্কসবাদকে ভিত্তি করে শ্রমিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাকে তুলে ধরা। এ দেশে সেটা হতে পারল না যেহেতু যথার্থ মার্কসবাদী দল ছিল না। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই, যেখান থেকে সিপিএম এসেছে, এরা মার্কসবাদের নামে ভণ্ডামি করেছে, প্রতারণা করেছে। এরা শ্রমিকশ্রেণীর দল নয়, পেটি বুর্জোয়া দল। পেটি বুর্জোয়া মানেই হচ্ছে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে বুর্জোয়া শ্রেণীচিন্তারই প্রতিনিধিত্ব করা। সেদিন কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টির অভাববোধ করেছিলেন বলেই পরবর্তীকালে এই পার্টিটিকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, ভারতের পুঁজিবাদ শুধু পুঁজিবাদ নয়, একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে, এই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিয়েছে। তাই দেখুন আজ ভারতের টাটা, বিড়লা, আম্বানিরা বিদেশে পুঁজি রপ্তানি করছে, অন্য দেশে কলকারখানা কিনছে, পুঁজি বিনিয়োগ করছে, খনিতে বিনিয়োগ করছে। আর ভারত মিলিটারি শক্তি বাড়াচ্ছে প্রবল উদ্যমে। দেশে এত বেকার, এত সংকট, অথচ মিলিটারি বাজেটই সবচেয়ে বেশি। কেন তার এই প্রয়োজন? ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সে সম্পর্ক স্থাপন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ভারতকে। সে জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক নানা ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারত সরকারের একটা মৈত্রী গড়ে উঠছে। একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের সাথে আর একটা গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মিত্রতা গড়ে উঠছে, এ অতি বিপজ্জনক! দেশে কৃষি মার খাচ্ছে কখনও বন্যায়, কখনও খরায়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এ সব ক্ষেত্রে সরকারের টাকা নেই। অথচ সরকার টাকা ঢালছে সামরিক খাতে। কারণ সুপার পাওয়ার হওয়ার জন্য সামরিক শক্তি তার দরকার।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে, স্বাধীনতাকে ধ্বংস করছে। একটা

সাতের পাতায় দেখুন

পার্টির প্রাণসত্তা হচ্ছে সংস্কৃতি

উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে কমরেড রণজিৎ ধর

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ৩৫তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে ৩-৫ আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে তাঁর চিন্তা সংবলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৩ আগস্ট বিকাল ৫টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দলের পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড শংকর সাহা এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু।

কমরেড রণজিৎ ধর বলেন, প্রতি বছরই শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উপলক্ষে তাঁর চিন্তা-সংবলিত উদ্ধৃতি প্রদর্শনী করা হয়। এ বছর আমরা এই এই প্রদর্শনী করছি এমন একটা সময়ে, যখন এই পার্টিটাকে যাঁরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভারতবর্ষে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সকলেই একে একে আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সর্বশেষ ছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী, তাঁকেও আমরা হারিয়েছি। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের উপর একটা কঠিন দায়িত্ব বর্তেছে।

এই প্রদর্শনীতে কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনা থেকে যে অতি সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে প্রদর্শিত হয়েছে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়লেই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, বিশালতা আপনাদের চোখে পড়বে। বাস্তবে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যে জ্ঞান অর্জন করেছেন জ্ঞানজগতের সমস্ত শাখাকে ব্যাপ্ত করে— তারই কিছু অংশ আপনারা এখানে দেখতে পাবেন। শিবদাস ঘোষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রাম গড়ে তুলতে গিয়ে যে সত্যটা তিনি গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন, সেটা হচ্ছে, সর্বহারাশ্রেণীর প্রকৃত দল ছাড়া সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব সম্ভব নয়। যত সংগ্রামই হোক, যত আত্মত্যাগ হোক, তার মধ্যে যত আন্তরিকতা ও আবেগ থাকুক, বিপ্লব হবে না। বিপ্লবের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটা যথার্থ সর্বহারাশ্রেণীর দল।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে দল মানেই কোনও না কোনও শ্রেণীর দল। প্রত্যেকটা শ্রেণীর দলকে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে নিজ উদ্দেশ্য পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে গড়ে তোলা হয়। দল হচ্ছে শ্রেণীর লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার। প্রত্যেকটা শ্রেণীর দলের নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্য, আলাদা গঠনপদ্ধতি থাকে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলারও একটা বিশেষ সংগ্রাম আছে। সেই সংগ্রাম ব্যতিরেকে সর্বহারা শ্রেণীর দল গড়ে উঠতে পারে না। একটা শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করা এবং তাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে যে রাজনৈতিক দল তৈরি করা হয়, অন্যদিকে একটা শোষণ ব্যবস্থাকে উৎখাত করা, একটা শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে দল গড়ে তোলা হয়, এই দুই দলের গঠনপদ্ধতি ও সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ দেশে অনেক মার্কসবাদী নামের দল আছে, কিন্তু কোনও দলই, তাদের যত আন্তরিকতাই থাকুক, সংগ্রাম থাকুক, নিষ্ঠা থাকুক, সর্বহারা শ্রেণীর যথার্থ বিপ্লবী দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। যেটা কমরেড শিবদাস ঘোষ এক অসাধারণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মার্কস-লেনিনের কথাগুলো নকল করে যথার্থ মার্কসবাদী হওয়া যায় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে একটা বিচারধারা। যাকে হাতিয়ার করে কোনও দেশের বিশেষ পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে বিপ্লবের রণনীতি রণকৌশল নির্ধারণ করতে হয়। প্রতিটি নতুন নতুন পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বিচার করে এগোতে হয়। ভারতের বুকে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মূল কথা হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে নেতা-কর্মীদের চরিত্র গড়ে তুলতে হবে, এই সংস্কৃতির আধারে পার্টিটাকে গড়ে তুলতে হবে। সব বড় আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার উন্নত সংস্কৃতির মধ্যে। পার্টি নিছক কতকগুলো স্লোগান, কতকগুলো কর্মসূচি নয়। পার্টিকে নানা কর্মসূচি নিতে হয়, স্লোগান দিতে হয়, পোস্টার মারতে হয়, নানা আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়— সবই সত্য। কিন্তু এটাই পার্টি নয়। পার্টির প্রাণসত্তাটা হচ্ছে সংস্কৃতি। পার্টির রাজনৈতিক তত্ত্ব, বিশ্লেষণ, তার দৈনন্দিন কর্মসূচি নির্ধারণ— এগুলি সবই হচ্ছে তার কাঠামো। মূল প্রাণ হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করেই গোটা পার্টি গড়ে ওঠে। কিন্তু সর্বহারা সংস্কৃতিটা কী? এই সর্বহারা সংস্কৃতি বলতে মার্কসের শিক্ষাকে ভিত্তি করে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ব্যক্তি সম্পত্তি বিযুক্ত মানবতাবাদই হচ্ছে সাম্যবাদ। আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ব্যক্তিসম্পত্তিবোধের যে মানসিকতা, তার থেকে মুক্ত যে মানবতাবাদ, সেটাই হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতি। এর মূল কথাটা হচ্ছে ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিকতা যাকে আমরা বলি ব্যক্তিবাদ, সেই ব্যক্তিবাদের

৩ আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে বক্তব্য রাখছেন কমরেড রণজিৎ ধর। মঞ্চে অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রভাব থেকে মুক্ত করা গোটা পার্টিকে, তার নেতা ও কর্মীদের। এই সংগ্রামটাকে পার্টির অভ্যন্তরে নিয়ত জারি রাখা। এটা না করে এযুগে একটা যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। এই জন্য বলেছিলেন যে, রাশিয়ায় যখন বিপ্লব হয়েছিল, চীনে যখন বিপ্লব হয়েছিল তখন এই ব্যক্তিবাদটা যতটা প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, আজ এত বছর বাদে এই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আরও অনেক প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। যত দিন যাচ্ছে এই ব্যক্তিবাদ চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে। ১৯৭১ সালে নভেম্বর বিপ্লব দিবসের বক্তৃতায় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ব্যক্তিবাদ এখনই যে নোংরা রূপ ধারণ করেছে তাতেআরও ২০-৩০ বছর বাদে এটা আরও মারাত্মক রূপ নেবে এবং আজকের পরিস্থিতিতে এই ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই না করে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা যাবে না। কমরেড শিবদাস ঘোষের মহত্ত্ব এই জায়গাতেই যে, তিনি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-কে গড়ে তুলেছিলেন ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত থাকার সংগ্রামটাকে নিয়ত জারি রেখে। এই দলের সংগ্রামের মধ্যে তিনি একটা সংস্কৃতির কাঠামো দিয়েছেন যার মূল কথাটা হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতির ভিত্তিতে চরিত্র, ব্যক্তিবাদী মানসিকতামুক্ত চরিত্র। যদি ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত না রাখা যায় পার্টিকে, তাহলে সর্বহারা গণতন্ত্র পার্টির ভিতরে কাজ করতে পারে না। ১৯৭১ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন ব্যক্তিবাদের নোংরা প্রভাবের কথা, ভবিষ্যতে আরও মারাত্মক রূপে ব্যক্তিবাদের প্রকাশ ঘটার কথা বলেছিলেন, তারপর আমরা ৩৯ বছর পার হয়েছি, আজ যথার্থই তার নোংরা মারাত্মক রূপ আমরা দেখছি। আমরা যে সমাজপরিবেশে থাকি, যে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে থাকি, তাতে ব্যক্তিবাদের প্রভাব প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে পড়ছে। আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার পথে এ তো সবথেকে বড় বাধা। ঐ আলোচনাতে তিনি বলেছিলেন, কমিউনিস্ট হওয়ার মানে হচ্ছে, সমস্ত রকম নীচতা, হীনতা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতার থেকে নিজেকে মুক্ত করা। কমিউনিজমের মতো এত উচ্চ আদর্শ নিয়ে রাশিয়াতে বিপ্লব, চীনে বিপ্লব হওয়ার পরও যে পতন হল, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সংশোধনবাদ। সংশোধনবাদ কথাটার মানে হচ্ছে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ। এই বুর্জোয়া চিন্তাধারার মূল কথাটা হচ্ছে ব্যক্তিবাদ। সামগ্রিক স্বার্থের বাইরে, গোটা পার্টির স্বার্থ, আন্দোলনের স্বার্থ, সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের স্বার্থ, সমাজের বিকাশের স্বার্থ — এর বাইরে আমার ব্যক্তিস্বার্থ অতি সূক্ষ্মভাবে আমার মধ্যে কাজ করে ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মানসিকতা থেকে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, সংশোধনবাদের বিপদও রয়েছে এই জায়গাতেই। এবং যতদিন পর্যন্ত আমরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকব, ততদিন এই পুঁজিবাদের প্রভাব, ব্যক্তিবাদী চিন্তার প্রভাব আমাদের ক্ষুদ্র করবে, হীন করবে। বিপ্লবী দলের কর্মী হয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, নিজেকে সামনে নিয়ে যাওয়া, নিজেকে জাহির করা, মূলত ব্যক্তির মতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সমস্ত আলোচনা পরিচালনা করা — এই যে প্রবণতাগুলো আমরা দেখি, এসবই হচ্ছে ব্যক্তিবাদী প্রবণতা। এর হাত থেকে নেতা-কর্মীদের মুক্ত রাখার জন্য তিনি বলেছিলেন যে, দলের অভ্যন্তরে থাকবে খোলামেলা পরিবেশ, যেখানে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আমি কথা বলতে পারি, আমার কোনও ভয়, ভীতি, আশঙ্কা কাজ করবে না। দলের অভ্যন্তরে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নাহলে তর্ক-বিতর্ক-সমালোচনা ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে খোলা পরিবেশে হওয়া সম্ভব নয়। এই সংগ্রামটা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সচেতনভাবে দেখতে হয় এবং কর্মীদেরও সচেতনভাবে এই সংগ্রামটা করতে হয়। এই সংগ্রামটা না করলে আমরা যে যৌথজ্ঞানের কথা বলি, তা গড়ে উঠবে না। যৌথজ্ঞান কথাটা তো এ রকম নয় যে, কর্মীরা ফিল্ডে কাজ করে প্রতিদিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সেগুলোকে মিলিয়ে দিয়ে যোগ করলে যৌথজ্ঞান বেরিয়ে এল। না, এটা যৌথজ্ঞান নয়। প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সত্যকে বের করে সম্মিলিতভাবে যে সত্য ধারণায় পৌঁছাচ্ছি, সেটাই যৌথজ্ঞান। কোনও একটা বিষয় সম্পর্কে আমরা যারা একত্রে কাজ করি তাদের প্রত্যেকের যদি মতামত নেওয়া হয়, দেখা যাবে উপর উপর সকলের ধারণার মধ্যে একটা মিল থাকলেও সূক্ষ্মভাবে পার্থক্য কিছু না কিছু রয়েছেই। একই ঘটনা, একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক জনের মতামত জানতে

আটের পাতায় দেখুন

অনাহারীর দেশে ৬ লক্ষ লোকের দশ বছরের খাদ্য পচে গেল

তথ্য জানার অধিকার আইন (আর টি আই) প্রয়োগের ফলে সম্প্রতি মর্মস্পর্শী এক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। এই সংবাদে দেখা যাচ্ছে, গণবণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য চুরি হয় বিপুল পরিমাণে। খাদ্যশস্য চুরি হওয়ার ব্যাপারে বিচারপতি ওয়াধিয়া কমিশনের রিপোর্ট উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কমিশন বলেছে, খাদ্যশস্য প্রতিটি স্তরেই চুরি হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই ১৯১৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা মূল্যের খাদ্য, বাইরে পাচার হয় ২০০৬-২০০৭ সালে। আর একটা কথাও জানা গিয়েছে, ১০,৬৮৮ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, যা দিয়ে ৬ লক্ষ লোককে ১০ বছর খাওয়ানো যায়, তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি গুদামে পচে নষ্ট হয়েছে। ১৯৯৭-০৭ পর্যন্ত সময়ে ১.৮৩ লাখ টন গম, ৬.৩৩ লাখ টন চাল, ২.২০ লাখ টন ধান, ১১১ লাখ টন ভুট্টা পচে নষ্ট হয়েছে স্রেফ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। ২০১০-এর ৬ জানুয়ারি দেবাশীষ ভট্টাচার্যের আর টি আই দরখাস্তের পরিণামে এই চিত্র উদঘাটন হয়েছে। আচ্ছাদিত এফ সি আই গুদামের রক্ষণের ক্ষমতা ২৫৬.৬৪ লাখ টন এবং মোট মজুতের পরিমাণ ২১৮.৩৫ লাখ টন। তথ্যে জানা গেছে, এফ সি আই গুদামগুলিতে রক্ষণের ক্ষমতার তুলনায় খাদ্যশস্য কম পরিমাণে মজুত ছিল। যেমন, উত্তরাঞ্চলে সুরক্ষিত আচ্ছাদিত গুদামের রক্ষণ ক্ষমতা ১২৭.৪৮ লাখ টন, কিন্তু এতে মজুত আছে ১১১.৮২ লাখ টন। দক্ষিণাঞ্চলে আচ্ছাদিত গুদামের রক্ষণ ক্ষমতা ৫৭.৪৯ লাখ টন, মজুত ছিল ৫৪.২৪ লাখ টন। দেশের পূর্বাঞ্চলে আচ্ছাদিত গুদামের ধারণ ক্ষমতা ২৩.৯৯ লাখ টন, এখানে মজুত রয়েছে ১৭.১০ লাখ টন। (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া-২৮.০৭.'১০)

সবচেয়ে বেশি গম পচেছে পাঞ্জাবের গুদামগুলিতে। সংসদে দাঁড়িয়ে কৃষিমন্ত্রী সরকারি গুদামের ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ও অবহেলার জন্য বিপুল অপচয়ের তথ্য স্বীকার করে নেন। এ দিকে পাঞ্জাবে খাদ্য ও গণবণ্টন দপ্তরের মুখ্যসচিব এস পি সিং জানিয়েছেন, মজুতের জায়গার অভাব যেমন আছে তেমনি রক্ষণাবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থারও অভাব আছে। তাঁর কথামতো ঐ রাজ্যে ২১ লাখ টন গম মজুতের সুযোগ থাকলেও ১৪ লাখ টন গম তাদের রাখতে হয় কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ছাড়াই।

খাদ্য চুরি ও অবহেলায় পড়ে নষ্ট করার বিষয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিচারপতি দলবীর ভান্ডারী ও বিচারপতি দীপক ভার্মাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেছে, ''মানুষ যখন অনাহারে, তখন এক কণা খাদ্যশস্যও নষ্ট করা অপরাধ'' (বর্তমান ২৮.০৭.'১০)। কোর্ট বলেছে, পচতে দেওয়ার চেয়ে, যে সব গরিব মানুষ না খেয়ে থাকছে তাদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করে দেওয়া উচিত। এছাড়া কোর্ট মন্তব্য করেছে যে, এ পি এল গ্রাহকদের রেশনে খাদ্য দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। উত্থাপিত সমস্যার সঙ্গে এ পি এল গ্রাহকদের জন্য সরবরাহ বন্ধ করা কোনওভাবেই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যা সর্বোচ্চ আদালতের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে কালো ছায়া ফেলেছে। কারণ বি পি এল এবং এ পি এল-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য ফারাক কিছু নেই। দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষই যে হতদরিদ্র ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত। তা ছাড়া ন্যূনতম জনদরদ থাকলে দেশবাসীকে দু'বেলা পেটভরে খাওয়ানোর দায়িত্ব কোনও সরকারেরই অস্বীকার করা চলে না। দেশের বাজার পুরোপুরি বেসরকারি খাদ্য কর্পোরেট সংস্থার কব্জায় চলে যাওয়ায় খাদ্যের বাজার দর মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নেই বলে অর্ধাহার-অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এমনকী রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে ভারতবর্ষের বেশ কিছু রাজ্যের দারিদ্র আজ সাব-সাহারা দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে। ভারতের পাশে ইথিওপিয়ার তুলনা তো সত্যই মর্মান্তিক এক সত্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। এ কথা আজ মতলববাজরা ছাড়া সকলেই মনে করে, সার্বজনীন রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমেই সকল মানুষকে ন্যূনতম খাদ্যটুকু জোগান দেওয়া সম্ভব। নইলে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি অঘোষিত এক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করবে। বরঞ্চ বলা ভাল বেশ খানিকটা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। সরকার এই প্রশ্নে হাতগুটিয়ে বসে আছে, আর বিবৃতি দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে চর্বিত চর্বন করা হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সামনে রেখে। স্বল্পকালীন মেয়াদে ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে হারে সুদে ঋণ পায় (রেপো রেট) তা বেড়ে হয়েছে ৫.৭৫ শতাংশ। আর রির্জাভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে যে সুদ-হারে ঋণ নেয় তা বেড়ে হয়েছে ৪.৫০ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা রেপো রেট বেড়ে যাওয়ার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ধার নিতে বেশি সুদ গুনতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে। অপরপক্ষে, রিভার্স রেপো রেট বাড়ার ফলে দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ঋণ দিতেই বেশি আগ্রহী হবে ব্যাঙ্কগুলি। সুতরাং বলা হচ্ছে, অর্থনীতির নিয়মভিত্তিক নগদের জোগান কমবে বাজারে। তাই মুদ্রাস্ফীতি কমবে। জিনিসপত্রের দাম কমবে। মানে টাকার জোগান কম হবে, পণ্যের তুলনায় জোগান বেশি হবে, ফলে জিনিস সস্তা হবে।

বইপত্রে এ সব যাই লেখা থাক, এই ফর্মূলায় কবে মুদ্রাস্ফীতি কমেছে? জিনিসপত্র সস্তা হয়েছে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই কেরামতি তো প্রথম নয়। আসলে বাড়তি সুদ যদি ব্যবসাদারকে গুণতেই হয় তবে, দাম বাড়িয়ে বাড়তি পয়সা সে তুলে নেবে। এ ভাবে তারা নিয়েও থাকে। সুতরাং দাম কমবে না, বাড়বে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মোট জমা ও আবশ্যিক জমা (সি আর আর) ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও কিন্তু হেরফের হয়নি। অর্থমন্ত্রীর মতে, এটা করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে জমা টাকার পরিমাণ কমে যেত। ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হত। আসলে বাজার অগ্নিমূল্যই থাকবে। এজন্য অর্থমন্ত্রী ডিসেম্বর মাসে সস্তায় জিনিস পাওয়া যাবে বলে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। অথচ সার্বিক মূল্যবৃদ্ধি এখনই ১১ শতাংশ ছুঁয়ে যেতে পারে বলে অর্থনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন। ঠিক এমন অবস্থায় প্রতিদিন যেখানে খাদ্যদ্রব্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, সেখানে সরকার এ পি এল এবং বি পি এল সকলকেই খাওয়ানোর দায়িত্ব নেবে না কেন? বিশ্বায়নের অর্থনীতি ও গ্যাট চুক্তিতে বলা আছে খাদ্যের বাজার হবে খোলা বাজার এবং সুলভ গণবণ্টন ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে ধাপে ধাপে। সেই দিকেই সরকার এগোচ্ছে। তারই অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হল, গরিব জনতাকে এ পি এল এবং বি পি এলে ভাগ করা এবং এ পি এলের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা। অনেকেরই অভিজ্ঞতা, এ দেশে এ পি এলের নিম্নতম স্তরের সঙ্গে বি পি এলের পার্থক্য খুব নগণ্য। দেশের বাজার বলতে প্রধানত এরাই। এদের ঠিকমতো খাওয়া জোটে না। যারা দু'বেলা খাবার কিনতে পারে না, তারা শিল্পজাত পণ্য কিনবে কী করে? শিল্প সংকট এজন্যই স্থায়ী রূপ নিয়েছে।

সুতরাং, সর্বোচ্চ আদালতের প্রস্তাব সম্পর্কে তাই প্রশ্ন এসেই যায়, আদালত কি শাসকদের দিকে তাকিয়ে তাদের হাত শক্তিশালী করতে এমন সিদ্ধান্ত করছে? আদালত কি গ্যাটের নির্দেশকেই কার্যকর করতে চাইছে? ৬১তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় জানা যায় ভারতে গ্রামে মাথা পিছু মাসিক ব্যয় ৩৫৬.৩৫ টাকা, শহরে ৫৩৮.৬০ টাকা। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ফলে দেশের ১০ শতাংশ মানুষের হাতে দেশের ৩৩ শতাংশ সম্পদ ও আয় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। এমন এক দুর্দিনে এ পি এল-এর মানুষের খাওয়ানোর দায়িত্ব সরকার যাতে না নেয় তেমন পরামর্শ আদালত দিচ্ছে কাদের স্বার্থে? এ কণ্ঠস্বর কাদের?

বিশ্বায়নের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ফলে প্রবল খাদ্যসংকট ঘনীভূত। বিশ্বায়ন দুনিয়ার সর্বত্র কৃষিনীতির পরিবর্তন এনেছে। গত দশ বছরে এজন্য কৃষি উৎপাদনের হার ৫০ শতাংশের ওপর কমেছে। কৃষিতে উৎসাহ হারাচ্ছে মানুষ। গরিব দেশগুলোর ৫০ শতাংশের বেশি মানুষের ঠিকমতো খাবার জুটছে না। ৩০ বছরে ৮৩ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে। ভারতবর্ষ এই অর্থনীতি-রাজনীতির সঙ্গে জড়িত শুধু নয়, অন্যতম হোতা এই কর্মকাণ্ডের। পরিণতি তাই এত করুণ এ দেশে। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের কার্যনির্বাহী অধিকর্তা জোসেফ সিরান বলেছেন ''এ তো মৌন সুনামি। এখনই কিছু না করলে, অসহায় মৃত্যু ছাড়া হয়তো মানুষের কাছে আর কোনও রাস্তা থাকবে না'' (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.০৭.'১০)।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় থেকে যে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, তা কি মানবিক? আর্ত অসহায় মানুষের পক্ষে ন্যায়ের কণ্ঠস্বর? নাকি দেশের মুষ্টিমেয় লুঠেরা পুঁজিপতিদের কণ্ঠস্বর?

আদালত অবশ্য এ কথাও বলেছে, খাদ্য অপচয়, চুরি, দুর্নীতি ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ। কারণ মানুষ অনাহারে আছে। সংখ্যালঘিষ্ঠ পুঁজিপতিশ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে পুঁজির পাহাড় বানিয়ে চলেছে। এর থেকে অনৈতিক, দুর্নীতি আর কী হতে পারে? কিন্তু একটা অন্যায় ও অনৈতিকতার লুঠেরা অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর যে সভ্যতার উপরকাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে তা কীভাবে দুর্নীতি মুক্ত হতে পারবে? দুর্নীতিগ্রস্ত ভিত্তির উপরে সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরেই তাই দুর্নীতি, দুর্নীতির পোষণ। তাই ক্ষুধার্তের খাদ্য পচে যায়, গোখাদ্য হয়।

ফলে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, কর্তব্যে অবহেলা, তার পরিণামে খাদ্য পচে যাওয়া, আর তার প্রেক্ষিতেই এ পি এলদের খাদ্য না দেওয়ার জন্য কোর্টের বক্তব্য ইত্যাদি কোনওটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ সবের শিকড় এই অর্থনীতির ভিতরেই নিহিত। বি জে পি চালিত এন ডি এ সরকারের আমলেও গুদামজাত খাদ্য নষ্ট হয়ে গোখাদ্য হয়ে গিয়েছিল। গোখাদ্য হিসাবেই তা বাইরে চালান হয়েছিল অর্ধেক দামে। নষ্ট করার আগে তা দেশের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। কোনও পুঁজিবাদী দেশেই হয় না। কারণ খাদ্যের বাজার দর তা হলে নেমে যাবে। বাজার দর নেমে গেলে খাদ্য ব্যবসায়ীদের মুনাফার টান পড়বে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, অপচয় জিনিসটা পুঁজিবাদের মজ্জায় মজ্জায় রয়েছে। ধ্বংসের প্রবণতা পুঁজির নাড়িতে মিশে রয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষানুযায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে উপরকাঠামো— সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা, আইন-আদালত, রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, বিবেক, মনুষ্যত্বের ধারণা, মূল্যবোধ, সব কিছুই। পুঁজিবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছেছে। লেনিন বলেছেন, এই স্তরে পুঁজি সুদখোর চরিত্র অর্জন করে, প্যারাসাইট হয়ে যায়। শিল্প গড়া তথা সৃজনশীলতা হারায়। পুঁজিবাদের এই স্তরে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তির বিচ্ছিন্নতার ব্যাপকতা ও তীব্রতাবৃদ্ধি দেখা দেয়। উৎপাদন যন্ত্রের ক্ষমতা অব্যবহৃত থাকে অতিমাত্রায়। হয় ছাঁটাই, লক আউট, লে-অফের রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি। অর্থাৎ, মেহনতি শ্রেণীর সৃজনী ক্ষমতার অপচয় হয়। বেকারিত্ব বাড়তে থাকে, উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় হয়। উৎপাদন যন্ত্রের ক্ষমতাও পূর্ণ ব্যবহার হয় না— অলস হয়ে পড়ে। যন্ত্রের শক্তির অপচয় হয়। যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য, শ্রমিকের টেকনিক বৃদ্ধির জন্য যা বর্ধিত উৎপাদন হয়, তা কেনার মতো, লাভ জুগিয়ে কেনার ক্ষমতা বা ক্রয়ক্ষমতা ক্রমে কমতে থাকার দরুন সে সব গুদামজাত হয়ে থাকে, এখানেও দেখা যায়, ক্রয়ক্ষমতা ধ্বংস হচ্ছে। সে খাদ্য হোক, কাপড় হোক, ওষুধ হোক, যে কোনও পণ্য হোক অবিক্রিত থেকে নষ্ট হচ্ছে। তাই বলা যায়, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের মজ্জাগত ধর্ম হল ধ্বংস এবং অপচয়। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বাজার সংকট মোকাবিলার জন্য সামরিক অর্থনীতিতে জোর দেয়। তৈরি হয় মানুষের একান্ত অপ্রয়োজনীয় কামান, ট্যাঙ্ক, গোলা-বারুদ, যুদ্ধজাহাজ, যা উৎপাদিকাশক্তির বেদনাদায়ক অপচয়। এরই পরিণতিতে বাজার দখলের জন্য বাধে যুদ্ধ। শুরু হয় ধ্বংসলীলা। বিশ্বজুড়ে এটাই হচ্ছে। হচ্ছে ইরাকে, আফগানিস্তানে, প্যালেস্টাইনে, হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ মানেই ধ্বংস। উৎপাদন ক্ষমতার ধ্বংস। মানুষের ধ্বংস, প্রকৃতির ধ্বংস। হিরোসিমা নাগাসাকির বীভৎসা মানুষ আজও ভোলেনি। বিজ্ঞান আজ পুঁজিপতিদের ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে বন্দি হয়েছে মুনাফার কারাগারে। মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী কৃষির যা কিছু প্রগতি তা হল, শুধু শ্রমিককেই নয়, ভূমিকেও লুঠ করার কৌশলের প্রগতি ... পুঁজিবাদী উৎপাদন যন্ত্রবিদ্যা এবং উৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্মিলন ঘটায় কেবল এমন পথে, যাতে একই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয় সর্ব সম্পদের মূলাধার ভূমি ও শ্রমিক। (পুঁজি, খণ্ড-১ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ)।

আজ পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শিল্প গড়ে নয়, টাকা থেকে টাকা তৈরি করে ফাটকায়, শেয়ারে, সুদের কারবারে। এটাই প্রধান ধারা। তাই অপচয় করা, ধ্বংস করা, সৃষ্টির বদলে বন্ধ্যাত্ব, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিছু নয়। তাই মানুষকে না খাইয়ে খাদ্যের অপচয়, খাদ্য পচানো, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাব — পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্য এক ফল। যে রাজনীতি, যে সংস্কৃতি এই পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে চায়, সেই রাজনীতি ও সেই দল, সেই সব নেতারাও এই অপচয়, এই ধ্বংসের, এই বন্ধ্যাত্বের রক্ষক হয়ে উঠেছে। তাদের রাজনীতিও তাই গণস্বার্থবিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসাত্মক। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই অভিশাপকে, এই পরিস্থিতিকে কি আমরা মেনে নেব? না। এই দুর্নীতির অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে, খাদ্য অপচয়ের দরুন দায়ী সরকারি নেতা ও মন্ত্রীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইব। প্রতিটি মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব যাতে সরকার নেয় তেমন গণবণ্টন ব্যবস্থার দাবি তুলব। গড়ে তুলব আন্দোলন, দীর্ঘস্থায়ী পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক আদর্শের ভিত্তিতে।

আলিপুরদুয়ারে শিক্ষা কনভেনশন

২৫ জুলাই জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার ম্যাকউইলিয়াম হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন আলিপুরদুয়ার কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বিগত ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব সুধীর রঞ্জন ঘোষ। মূল প্রস্তাব পেশ করেন সলসলাবাড়ি মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সজলকান্তি মিত্র। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক কোলহা বড়াইক, শিক্ষক সত্যেন্দ্র নাথ দাস এবং সমাজকর্মী সুমন গোস্বামী। আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির সহ সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। অধ্যাপক সুধীর রঞ্জন ঘোষকে সভাপতি এবং সজলকান্তি মিত্রকে সম্পাদক করে ২৭ জনের সেভ এডুকেশন কমিটির আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাখা গঠিত হয়।

ব্যক্তিবাদের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষই প্রথম হুঁশিয়ারি দেন

চারের পাতার পর

স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাককে দখল করে ধ্বংস করল এই যুক্তিতে যে, ইরাক নাকি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। তাকে ধ্বংস করার দায়িত্ব পড়েছে আমেরিকার ওপর! অথচ দেখা গেল, মারণাস্ত্র কেন, অস্ত্রের একটা ভাঙা টুকরোও কোথাও খুঁজে পায়নি। ওরা একটা দেশকে ধ্বংস করল। আফগানিস্তানে আক্রমণ চালাচ্ছে দীর্ঘদিন। কীসের প্রয়োজনে? না, নিজের দেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে। তার মিলিটারি অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে, বিদেশে তার দাপট রক্ষা করার প্রয়োজনে। আমাদের দেশের একদল বুদ্ধিজীবী দেখতে পান না, কীভাবে গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা স্বাধীন দেশের দখলদারি, ধ্বংস ও গণহত্যা, বন্দিশিবিরে নারকীয় অত্যাচার, প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যা, বিরোধীদের গুপ্তহত্যা লাগাতার চলছে। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে সোভিয়েট ইউনিয়নে হিটলারের যারা গুপ্তচর হয়ে কাজ করছিল, সোভিয়েটকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল, যাদের বিচার করে শাস্তি দিয়েছিলেন স্ট্যালিন, সোভিয়েটকে, গোটা বিশ্বকে হিটলারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে, তার মধ্যে 'বর্বরতা' আবিষ্কার করে আজও মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা করে যাচ্ছেন। অথচ সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনও দেশ দখল করেছিল কি? কোথাও যুদ্ধ বাধিয়েছিল কি? বরং দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তির হাত থেকে অসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণতন্ত্রের নামে বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, সেই দেশের সাথে ভারত সরকার নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সম্পর্ক স্থাপন করছে, অথচ তার বিরুদ্ধে এই বুদ্ধিজীবীদের কলম চলে না। এঁরা কি বুদ্ধিজীবী? এঁদের কি বিন্দুমাত্র গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্নও বলা যায়?

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিক থেকে আজ আমাদের সামনে সর্বাত্মক সংকট। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এই পুঁজিবাদকে যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা না যায়, তবে এই সংকট আরও বাড়বে। তিনি বলেছেন, ভোট আর বিপ্লব এক নয়, ভোটের দ্বারা বিপ্লব হয় না, রাষ্ট্র ও শোষণব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয় না। কোনও দল যদি সৎভাবে সরকার চালাবার চেষ্টা করে, এমনকী, যুক্তির খাতিরে বলছি, আমাদের দল এস ইউ সি আই (সি) ও যদি এককভাবে ভোটে মেজরিটি পেয়ে সরকার চালায়, তাহলেও আমরা শোষণ বন্ধ করতে পারব না। কারণ ভোটের দ্বারা সরকার পাল্টায়, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যায় না, পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানে তার স্থায়ী তিনটি অর্গ্যান। সামরিক বাহিনী, বিচারব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্র সহ পুলিশ প্রশাসন। এর কোনওটাই ভোটে পাল্টায় না। আর এই তিনটের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হচ্ছে মিলিটারি। ফলে কোনও সরকার যদি পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করে, রাষ্ট্রের একটা সেকেন্ডও লাগবে না মিলিটারি দিয়ে তাকে হঠিয়ে দিতে। সেই জন্যই মার্কসবাদ বলেছে, ভোট নয়, বিপ্লব চাই। বিপ্লবের দ্বারাই একমাত্র এই শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ সম্ভব।

আপনারা জানেন, আমরা এ রাজ্যে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছি দীর্ঘদিন, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। পরবর্তীকালে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেস আলাদা হল। যদিও কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে কোনও নীতিগত পার্থক্য নেই। এ কথা শুধু আমরা নয়, তৃণমূলের নেতারাও বলছেন। যাই হোক, আমরা আমাদের মতো পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৭ সাল থেকে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি সংগঠিতভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে, গণকমিটি গঠন করে। অনেক পরে তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের দ্বারা সরকার পরিবর্তনের লক্ষ নিয়ে গান্ধীবাদী প্রথায় অবস্থান, অনশন, পদযাত্রা আইনঅমান্য এইসব করেছে। আমরা একত্রিত হয়েছিলাম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য। এর আগেও এ কথা আমরা বলেছি। এই আন্দোলনে আমরা দু'টি দল একত্রিত না হলে সিঙ্গুর আন্দোলন, নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে রক্ষা করা যেত না। এই আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য, সিপিএমের ফ্যাসিস্ট আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্য আমরা একত্রিত হয়েছিলাম তিনটি শর্তকে ভিত্তি করে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই হবে, কংগ্রেস ও বিজেপির থেকে সমদূরত্ব থাকবে, আর মার্কসবাদ-বামপন্থাকে আক্রমণ করা হবে না। এ কথা আমি ও তৃণমূল নেত্রী একই মঞ্চে বসে ঘোষণা করেছিলাম। কিন্তু চলার পথে তৃণমূল কংগ্রেস আজ কেন্দ্রীয় সরকারে গেছে, কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন করার কোনও প্রশ্ন আজ নেই, সমদূরত্বও তাঁরা রক্ষা করতে পারলেন না। একটা জিনিস তাঁরা রক্ষা করছেন, রাজ্যে আমরা সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তাঁরাও করছেন। মার্কসবাদ-বামপন্থাকে আক্রমণ করা হবে না— এ কথা তাঁরা রক্ষা করছেন। তাঁরা চান সিপিএম সরকারের অবসান। আমরাও চাই সিপিএম সরকারের অবসান। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার এক নয়। আমরা চাই, সিপিএমের ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণ, অত্যাচারী শাসন, দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন, প্রশাসন ও পুলিশের উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ, একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, কোথাও প্রতিবাদ করার উপায় নেই — এর অবসান ঘটুক, মানুষের প্রতিবাদ করার, আন্দোলন করার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হোক। তৃণমূল কংগ্রেস বলছে, তাঁরা সরকারে গেলে অনেক সমস্যার সমাধান করবেন। তাঁরা চেষ্টা করতে পারেন, করবেন কি করবেন না, তা আপনারা দেখতে পাবেন। আমরা মনে করি, যদি তাঁরা সততার সাথেও চেষ্টা করেন, তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা যদি অন্তত এইটুকু করেন যে, পুলিশের উপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা খানিকটা রক্ষিত হবে, নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরে যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ হয়েছিল, গণআন্দোলন দমনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, দুর্নীতি কিছুটা বন্ধ হবে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ হবে না — তা হলেও আমরা মনে করব, খানিকটা হলেও অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন, মালিকদের বিরুদ্ধে, জোতদারদের বিরুদ্ধে, জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব। আমরা আন্দোলনের দল, রাস্তার লড়াইয়ের দল, আমরা রাস্তায় আছি, রাস্তাতেই থাকব। বিধানসভা, লোকসভায় যাই রাস্তার মানুষের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ কথা তৃণমূল কংগ্রেসও জানে, সকলেই জানে। আমরা মানুষকে কখনও ঠকাই না। আমরা যদি মন্ত্রীত্বের লোভে যেতাম, তাহলে সিপিএমের সঙ্গেই যেতে পারতাম। শত্রুপক্ষও জানে, এ রাজ্যে আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআইয়ের থেকে আমাদের শক্তি বেশি। আমাদের অতীতে সিপিএম ডেকেছে, আমরা যাইনি। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আমাদের ঐক্য আন্দোলনের স্বার্থে। আন্দোলনের জন্য যতক্ষণ যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু আমাদের একত্রে থাকা।

আপনারা দেখছেন, আজ ভারতে, গোটা বিশ্বে সাধারণ মানুষ কীভাবে আছে, এটা পুঁজিপতিশ্রেণীর দেখার বিষয় নয়। তার চাই লাভ, আরও লাভ। মানুষ মরুক, পথের ভিখারি হোক, সে নিয়ে তার কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। এই যে ব্যক্তিগত মুনাফার স্বার্থই চূড়ান্ত, ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, পুঁজিবাদের প্রথম যুগে এটা ছিল না। তখন পুঁজিবাদ ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করছে সমাজের উৎপাদনের বিকাশের স্বার্থে, ফলে তখন ব্যক্তিগত মালিকানাটাও ছিল প্রগতিমূলক। তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকারটাও ছিল প্রগতিমূলক। এই সময় নবজাগরণ চরিত্র দিয়েছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চরিত্র দিয়েছে। আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনও চরিত্র দিয়েছে। আজকে পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির যুগে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল। ফলে মুনাফার জন্যই পররাজ্য আক্রমণ, মুনাফার জন্যই লুণ্ঠন। মুনাফার জন্যই ছাঁটাই। মুনাফার জন্যই সবকিছু। এই যে ব্যক্তিমালিকের স্বার্থই চূড়ান্ত — এখানেই মনুষ্যত্বের সংকট, এখান থেকেই সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা কুৎসিত চরিত্র নিয়েছে, যেখানে কোনও নীতিনৈতিকতা নেই, কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। জাতীয়তাবাদের আদর্শ একদিন চরিত্র দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য ছিল তার মূল কথা। এই জাতীয় ঐক্য মানে শিল্পপতি-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র সম্মিলিতভাবে লড়াই সাম্রাজ্যবাদের, সামন্ততন্ত্রের অবসানের জন্য। আজকে সেই শিল্পপতিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। ধনীরাই রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে আজ শ্রমিক-মালিকের ঐক্য মানেই হচ্ছে শ্রমিকের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের গোলামি করা। ফলে জাতীয় ঐক্যের স্লোগান, জাতীয়তাবাদ আজ আর চরিত্র দিতে পারে না। আজ জাতীয়তাবাদের যারা স্লোগান দেয়, তারা টাকার গদিতে বসে, কোটি কোটি টাকা কামায়। আজকে জাতীয়তাবাদ, বন্দেমাতরম হচ্ছে লাইসেন্স, পারমিট, সুবিধা গোছাবার জন্য ইনভেস্টমেন্ট। এ আর ক্যারেক্টার দেয় না। একটা আদর্শ, একটা নীতি ততক্ষণই চরিত্র দেয়, যতক্ষণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখায়, আদর্শের জন্য মরতে শেখায়, ত্যাগ করতে শেখায়। ধর্মও একদিন চরিত্র দিয়েছিল। যখন ধর্ম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়েছে, তা সমাজে ন্যায়নীতি বোধ, কর্তব্যবোধ এনেছিল। ধর্ম কালের গতিতে যখন সেই চরিত্র হারাল, তখনই এল ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত মানবতাবাদ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে এভাবে সেক্যুলার হিউম্যানিজম এল। এই মানবতাবাদের দৃষ্টিতে ধনী ও গরিব সকলেই আইনের চোখে সমান। আজকের যুগে এই সাম্যের কতটুকু মূল্য আছে? একজন রাজপ্রাসাদে জন্ম নেয়, আর একজন বস্তির ছেঁড়া চটের ঘরে জন্ম নেয়, একজন ফাইভ স্টার হোটেলে ব্রেকফাস্ট খায়, আর একজন রাস্তায় ভিক্ষা করে— এরা কিন্তু সকলেই আইনের চোখে সমান! কিন্তু বাস্তবে কি তাই? বাস্তবে কি এরা সমান? বাস্তবে শ্রেণীবৈষম্য চলছে, এরা শ্রেণীতে বিভক্ত। শোষক-শোষিতে বিভক্ত। কিন্তু মানবতাবাদ এভাবে দেখে না। ফলে মানবতাবাদ শ্রেণীবৈষম্যকে, শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে। ফলে এই মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ আজ আর চরিত্র দিতে, মনুষ্যত্ব দিতে পারে না। পুঁজিবাদ যত প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে, তত তা মানুষকে অমানুষ করছে। আজ পুঁজিবাদ চায়, যুবকদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হোক, ধ্বংস হোক।

তাই যে কথা বলছিলাম, ব্যক্তিবাদ যে এদেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল রূপ নিয়ে এমনকী সাম্যবাদী আন্দোলনে বিপদ সৃষ্টি করবে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও তাকে বিপন্ন করবে, সংশোধনবাদের জন্ম দেবে, এই হুঁশিয়ারি প্রথম দিয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। এদেশে পার্টি গঠনের প্রথম পর্বেই, সেই ১৯৪৬-'৪৮ সালেই তিনি বলেছিলেন, বিপ্লবের স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ — নেতাদের ক্ষেত্রে এই বুর্জোয়া মানবতাবাদী স্তর থাকলে সর্বহারার বিপ্লবী দল গড়ে উঠবে না। নেতাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রভাব তথা ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে। শুধু সম্পত্তির প্রশ্নে নয়, স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, ন্যায়-নীতিবোধ সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবাদের প্রভাবমুক্ত হতে হবে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সব ক্ষেত্রেই এটা করতে হবে। ব্যক্তিকে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তিসম্পত্তিজাত মনন থেকে মুক্ত হয়ে বিপ্লবের স্বার্থের সাথে একাত্ম হতে হবে। আমার সম্পত্তি নেই, কিন্তু নামের লোভ আছে, পদের লোভ আছে — এগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে। বিপ্লবের স্বার্থই ব্যক্তিস্বার্থ, সমাজের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ, দলের স্বার্থই ব্যক্তির স্বার্থ— এই স্তর অর্জন করতে হবে, না হলে বিপ্লবী আন্দোলন হবে না। আর বলেছিলেন, রাশিয়া এবং চীনেও সমাজতন্ত্র বিপন্ন হবে ব্যক্তিবাদের দ্বারা। মহান স্ট্যালিন শেষজীবনে এ কথা বুঝেছিলেন। ১৯তম সোভিয়েট পার্টি কংগ্রেসেই তিনি প্রথম বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে ব্যক্তিমালিকানার অবসান হলেও, ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক মানসিকতা ও রুচি থেকে গেছে, এর বিরুদ্ধে তিনি লড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু লড়বার তিনি সময় পাননি। আবার মাও সে-তুংও শেষজীবনে পুঁজিবাদের আক্রমণ দেখে সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ করে যেতে পারেননি। কিন্তু কেন দু' দেশে সমাজতন্ত্র বিপন্ন হল, এই শিক্ষা কমরেড শিবদাস ঘোষ দিয়ে গেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের পরবর্তী সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্যেই আমরা মার্কসবাদের আরও উন্নত রূপ ও উপলব্ধি পাই। তাই শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাঁরা কমিউনিজমের জন্য লড়ছেন, বিপ্লব চান, তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে মূল্য দিচ্ছেন।

আমি আর একটি কথা আপনাদের বলব। রাশিয়ায় ও চীনে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরও তা কীভাবে ধ্বংস হল তা আমরা দেখলাম। আর আমরা যে ভারতে বিপ্লবের জন্য সংগ্রাম করছি, সেখানে অর্থনীতি পুঁজিবাদী, রাজনীতি পুঁজিবাদী, সংস্কৃতিতে পুঁজিবাদেরই প্রাধান্য। দলে যাঁরা আসছেন, তাঁরা এই কাদামাটি নিয়েই আসছেন। একটু অসতর্ক থাকলেই, আমাদের পার্টির বিপ্লবী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মৃত্যুর আগে কমরেড নীহার মুখার্জী, পার্টির মধ্যে এই বিপদ যাতে না হয়, যাতে বুর্জোয়া আদর্শ-সংস্কৃতির প্রভাব পার্টিকে ভিতর থেকে নষ্ট না করে, তার জন্য এক সর্বাত্মক সংগ্রামের সূচনা ঘটান রিভাইটালাইজেশন অ্যান্ড কনসোলিডেশন মুভমেন্টের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সেটাও শেষ গ্যারান্টি নয়। আক্রমণ আসছে, আক্রমণ আরও আসবে। দলকে রক্ষা করার দায়িত্ব দলের কর্মীদের, সমর্থকদের, জনগণের। কর্মীদের বলব, আমাদের স্তর থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরে নেতাদের আপনারা বিচার করবেন। এখানে অন্ধতার কোনও স্থান নেই। অন্ধতা অনেক ক্ষতি করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণ অন্ধভাবে গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে সমর্থন করেছিল, নেতাজিকে করেনি, তার মাশুল দিতে হচ্ছে। আজকে সিপিএম ধিক্কৃত পশ্চিমবাংলায়। অথচ '৬৪-'৬৫-'৬৬ সালে এই পশ্চিমবাংলাই তো অঙ্কের মতো সিপিএমকে সমর্থন করেছিল! তখন সিপিএমের সমালোচনা জনগণ শুনতেই চাইত না। দলের কর্মীরাও শুনতে চাইত না। জনগণ ও কর্মীরা অন্ধ থাকলে এই বিপদই ঘটে। ফলে আমাদের দলকেও অন্ধভাবে সমর্থন করবেন না। আমরা যা বলি সে কথা ঠিক কি না, যা বলি তা মেনে চলছি কি না, আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী চলছি কি

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

অন্যান্য রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস

উপরে কেরালার ত্রিচুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী এবং নিচে পাটনার সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান

উপরে রাজস্থানের জয়পুরের সভায় পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং নিচে আমেদাবাদের সভায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী

উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধনে কমরেড রণজিৎ ধর

পাঁচের পাতার পর

চাইলে দেখা যাবে, মূলগতভাবে এক থাকলেও সূক্ষ্ম বিচারে কিছু না কিছু পার্থক্য ঘটছেই। এই পার্থক্যগুলো ঘটে প্রত্যেকের মানসিক গঠন আলাদা আলাদা বলে। আমার যে মানসিক ধাঁচা, যে সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি, সেটা আমার মনকে যেমন করে গড়ে দিয়েছে, তার ভিত্তিতে তো আমি দেখি। আমি দেখি মানে মন দেখে। আমার বিচার ক্ষমতা দেখে। আমি যেভাবে দেখি বিষয়টাকে, সেটা হচ্ছে আমার বিচার ক্ষমতা, দেখবার ক্ষমতা, আমার উপলব্ধি। আমরা যা দেখি, সকলেই মনে করি, তা আমি ঠিক দেখছি। সকলেই কিন্তু ঠিক দেখি না। অনেকটা ঠিক দেখি, অনেকটা আমার মনের ধারণা অনুযায়ী, মানসিক ধাঁচা অনুযায়ী দেখি। সেখানে যৌথক্রিয়ার মানে হচ্ছে, আমাদের সকলের মধ্যে কিছু কল্পনা আর কিছু সত্য যা মিশে থাকে, আমার বিশেষ মানসিক ধাঁচার থেকে যেগুলো আসে, যেগুলো ঠিক নয়, সেগুলোকে আমরা বাদ দিই। বাদ দেব তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে। এই তর্কবিতর্কের মধ্যে যদি ধৈর্য না থাকে, একের অপরের কথা শোনার প্রবণতা না থাকে, মানসিকতা না থাকে, অধৈর্য হয়ে যাই, আমার কথাটাই আমি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি, তা হলে তো সত্য আসতে পারে না, তা হলে যৌথজ্ঞান আসতে পারে না। আবার, পার্টির ভেতরে তর্কবিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কমিটি মিটিং যাই কিছু করি না কেন, সচেতনভাবে সেগুলি না করলে আমরা অজানিতভাবে ব্যক্তিবাদের শিকার হয়ে যাই। তা হলে সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র, সর্বহারা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে পার্টি গড়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে চিন্তাকে মুক্ত করার সংগ্রামটা এত সহজ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রামটা অত্যন্ত কঠিন। অত সহজে কোনও দেশে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে না। একটা সত্যিকারের সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলার পিছনে অনেক অধ্যবসায়, অনেক পরিশ্রম থাকে। একটা বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে, ব্যক্তিবাদী স্বার্থের উপর ভিত্তি করে যে সমাজটা চলছে, সেই সমাজের মধ্যে সামাজিক স্বার্থবোধের ভিত্তিতে মন গড়ে তোলা, তার ভিত্তিতে একটা পার্টি গড়ে তোলা, এত সহজ কথা নয়। এই কাজটা শিবদাস ঘোষ করেছিলেন। এইখানেই শিবদাস ঘোষ শ্রেষ্ঠ।

ব্যক্তিবাদ কি কেবল মোটা দাগে ঘর-বাড়ি-আরাম-আয়েশ চাওয়ার মধ্য দিয়েই কাজ করে না কি? পার্টিজীবনে দীর্ঘকাল থেকে আমি কী পেয়েছি, কী পাইনি, আমার কী পাওয়া উচিত ছিল, কী পাওয়া হয়নি —এর হিসাবনিকাশ, অতি সূক্ষ্ম আকারে, অজানিতভাবে মনের মধ্যে ছাপ ফেলে। এর হাত থেকে মুক্ত থাকতে একমাত্র সেই পারে, যে প্রতি মুহূর্তে নিজের মনকে বিচার করছে। এই কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শিবদাস ঘোষ পার্টিটাকে গড়ে তুলেছিলেন। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, শিবদাস ঘোষকে বুঝতে হলে তাঁর এই সংগ্রামটাকে বুঝতে হবে। তাঁর চরিত্রকে বুঝতে হবে, তাঁর মহত্ত্বকে বুঝতে হবে। আপনারা উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে তার চিহ্ন দেখতে পাবেন। এই চিন্তাটা এমনি এমনি আসেনি। তা একটা সংগ্রামের, একটা বিশেষ সংগ্রামের ফল। একটা বিশেষ জীবনসংগ্রামের ফল। সমাজের মুক্তি, শোষণ থেকে, অত্যাচার থেকে, অবিচার থেকে মানুষের মুক্তির সংগ্রামটা করতে গিয়ে তিনি সমস্ত জীবনে যে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তা বইপড়া জ্ঞান নয়। বই তিনি পড়েননি এটা কথা নয়, কিন্তু যা তিনি পড়েছেন, সমস্ত কিছু নিজের জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যাচাই করেছেন, পরীক্ষা করেছেন, তারপর গ্রহণ করেছেন। নির্বিচারে গ্রহণ করেননি। শিবদাস ঘোষের এই বিশেষ সংগ্রামটাকে লক্ষ রেখে আজ আমাদের এগোতে হবে। আমি যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমাদের পার্টি গঠন করার কঠোর সংগ্রামটা যাঁরা শুরু করেছিলেন, তার শেষ প্রতিনিধি কমরেড নীহার মুখার্জীকে আমরা হারিয়েছি। আজ আমাদের উপরে দায়িত্ব বর্তেছে, এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। তা যদি আমরা করতে পারি তবেই এই উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, আলোচনা সমস্ত কিছুর মানে আছে। এই কথা বলেই আমি আজকের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছি।

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

সাতের পাতার পর

না, বিপ্লবের ঝাণ্ডা ঠিকভাবে বহন করছি কি না, তা জনগণকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ রাখতে হবে। এস ইউ সি আই (সি) শুধু আমাদের দল নয়, এ দলটা গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের প্রয়োজনে, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের প্রয়োজনে। এ তাদেরই দল। তাদের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করেই তো কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দল গড়েছেন। এ দল তো মন্ত্রী হওয়ার জন্য লড়েনি, এম এল এ-এম পি হওয়ার জন্য লড়েনি, নাম করার জন্য লড়েনি, বিপ্লবের জন্য লড়ছে। এই বিপ্লবী দলকে রক্ষা করার দায়িত্ব জনগণের। আপনারা রক্ষা করবেন। রাস্তায়, পথে-ঘাটে যেখানেই আমাদের দেখুন, এতটুকু আমাদের কথা এবং কাজে অসঙ্গতি দেখলে সতর্ক করুন। আপনাদের চেতনা দলকে রক্ষা করবে। সমর্থক-কর্মীদের চেতনা নেতাদের রক্ষা করবে। যেকোনও নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে এতটুকু বিচ্যুত হচ্ছেন দেখলে, কোনও অবলিগেশন থেকে চুপ করে থাকা নয়, তার বিরুদ্ধে কর্মীদের বাঘের মতো লড়তে হবে দলকে রক্ষা করার জন্য। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের অন্ধতা দলের সর্বনাশ করেছে। যতদিন স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ছিল, অন্ধতা ততদিন ক্ষতি করেনি, স্ট্যালিনের পথ ঠিক ছিল। স্ট্যালিনের পরবর্তীকালে যাঁরা এলেন, সেই ক্রুশ্চেভরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ করতে করতে কী সর্বনাশ করছে, তা দলের প্রতি অন্ধতা থেকে, নেতাদের প্রতি অন্ধতা থেকে কর্মীরা বুঝতে পারেনি, দেশের শ্রমিকশ্রেণী বুঝতে পারেনি। আজ তাই রাশিয়ার জনগণ কাঁদছে। আমাদের কর্মীদেরও চাই সজাগ দৃষ্টি ও সচেতনতা। কর্মীদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে বুঝতে হবে। সেই শিক্ষার আলোকে দলকে বিচার করতে হবে, নেতৃত্বকে বিচার করতে হবে, প্রত্যেক নেতাকে বিচার করতে হবে। অমুক নেতা আমার বন্ধু, আমরা একত্রে পার্টিতে এসেছি, অমুক নেতা আমাকে দলে এনেছেন, অমুক নেতা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন — এগুলি সব ব্যক্তিগত দুর্বলতা, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা। এ দিয়ে সঠিক বিচার হয় না। একদিন একজন সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু আজ তার পচন ধরেছে। আমি একদিন ভাল কাজ করেছি, আপনারা প্রশংসা করেছেন, আজ আমার পচন ধরেছে। সেই পচনটাকেও আপনার লক্ষ রাখতে হবে। আমরা তো দেখলাম, লেনিন-মাও সে-তুং জিন্দাবাদ করতে করতেই কীভাবে একদল নেতা পার্টিকে, সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করল। ফলে, আমি শিবদাস ঘোষ জিন্দাবাদ করতে করতেই পার্টির ক্ষতি করতে পারি। সেজন্য আপনাদের কাছে আবেদন, আমাদের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির আজ আর কেউ নেই। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটিরও কয়েকজন মৃত, কয়েকজন অসুস্থ। আমরা পলিটব্যুরোর যে ক'জন আছি, আমাদেরও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই মহান মানুষটির কাছে। কারণ তাঁর গভীর সান্নিধ্যে বসে আমরা শিখেছি, তাই এতদিন লড়তে পারছি। যতদিন প্রাণ থাকবে লড়ব। আগামী দিনে যখন আমরাও থাকব না, পরবর্তী প্রজন্ম যাঁরা আসবেন, এই পার্টিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁদের। কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিকে ভারতবর্ষের নবজাগরণ, স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লববাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, আর এক দিকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুংয়ের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এর সম্মিলিত সৃষ্টি হলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই দলই আজকের সর্বাত্মক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে একমাত্র আশার আলো। ফলে এই দলকে, এই আদর্শকে, এই মহৎ আন্দোলনকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। এ কথা বলেই আজ আমি শেষ করছি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in